অধ্যায় ১০ মানবদেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)
Protection of Human Body (Immunity)

মানবদেহে সংক্রমণ এড়ানোর প্রধান উপায় হচ্ছে দেহের ভিতরে জীবাণুর প্রবেশে বাধা দেয়া। চামড়া, ক্ষত, নাক, মুখ বা অন্য যেকোনো উপায়ে জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হলে শুরু হয় আক্রান্ত জীবাণুর সংক্রমণ থেকে দেহকে বাঁচানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস। দেহের ভিতরে ও বাইরে রোগ জীবাণু ধ্বংসের এক জটিল ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা **ইমিউনতন্ত্র** নামে পরিচিত। **যে প্রক্রিয়ায় দেহ ক্ষতিকর অণুজীব এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাকে ইমিউনিটি (immunity) বা অনাক্রম্যতা বলে**। ইমিউনিটি দুর্বল হলে ভ্যাক্সিন বা টিকা দিয়ে সবল করে তোলা হয়।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- সেরুমেন
- ফ্যাগোসাইট
- ইন্টারফেরন
- T-কোষ
- B-কোষ
- অ্যান্টিজেন
- অ্যান্টিবডি
- সহজাত প্রতিরক্ষা
- অর্জিত প্রতিরক্ষা
- স্মৃতিকোষ
- প্যারাটপ
- ভ্যাক্সিন
- গুটি বসন্ত
- বুস্টার ডোজ

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখব	পাঠ পরিকল্পনা	
❑ মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা	পাঠ ১	মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
❑ মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে ত্বকের ভূমিকা	পাঠ ২	প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর
❑ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরিপাক নালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা	পাঠ ৩	দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
❑ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলের ভূমিকা	পাঠ ৪	তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
❑ মানবদেহের সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা	পাঠ ৫	প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা
❑ মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার ভূমিকা	পাঠ ৬	প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা
❑ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা তৈরিতে মেমোরি কোষের ভূমিকা	পাঠ ৭	প্রতিরক্ষায় স্মৃতিকোষের ভূমিকা

CamScanner

ইমিউনিটি এবং ইমিউনোলজি (Immunity and Immunology)

অনাক্রম্যতাবিজ্ঞান বা **ইমিউনোলজি** (immunology) জীব-চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যার অধীত বিষয় হলো মানবদেহ তথা জীবদেহ কিভাবে **বহিঃস্থ রোগজীবাণু বা প্যাথোজেন** (pathogen) এর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা **অনাক্রম্যতা/ইমিউনিটি** (immunity) গড়ে তোলে এবং কোনটি তার আপন এবং কোনটি তার পর (foreign) অর্থাৎ ক্ষতিকর তা নির্ণয় করে। কেউ কেউ আবার ইমিউনোলজি/অনাক্রম্যতাবিজ্ঞানকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করেছেন: **বিভিন্ন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহকে রোগ আক্রমণ থেকে এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে এ রূপ বিদ্যা/জ্ঞানকে ইমিউনোলজি বা অনাক্রম্যতাবিজ্ঞান** বলে।

আর যে প্রক্রিয়ায় দেহ ক্ষতিকর অণুজীব এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাকে **ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা** বলে। Sir Macfarlane Burne কর্তৃক প্রদত্ত ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতার সংজ্ঞাটি হলো– **বহিরাগত কোন অবাঞ্ছিত বস্তুর অনুপ্রবেশকে জীবদেহের শনাক্তকরণের সামর্থ এবং দ্রুত ও কার্যকরভাবে দেহ থেকে উক্ত অবাঞ্ছিত বস্তুকে নিষ্ক্রমণের লক্ষে কোষ এবং কোষীয় বস্তুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।**

ইমিউনতন্ত্র বা অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গসমূহ (Organs of Immune System)

মানবদেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহকে **লিম্ফয়েড অঙ্গ** (lymphoid organs) বলে, কারণ এগুলো **লিম্ফোসাইটস** (lymphocytes) নামক ক্ষুদ্র রক্তকণিকা উৎপাদন ও সঞ্চয় করে যারা অনাক্রম্য ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা পালন করে।

রক্তনালি ও লসিকানালি দেহের বিভিন্ন স্থানে লিম্ফোসাইটস পরিবহন করে লিম্ফয়েড অঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন প্রকার লিম্ফয়েড অঙ্গগুলোর অবস্থান নিম্নরূপ –

১. **থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)** : শ্বাসনালির পিছনে অবস্থান করে। থাইমাস T-কোষ উৎপাদন করে।

২. **অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি (Adenoids)** : নাসিকা নালির পিছনে অবস্থিত দুটি গ্রন্থি।

৩. **অ্যাপেন্ডিক্স (Appendix)** : বৃহদন্ত্রের সাথে যুক্ত নলাকার গঠন বিশেষ।

৪. **রক্তনালি সমূহ (Blood vessels)** : দেহের সর্বত্র বিস্তৃত শিরা, ধমনি ও কৈশিক জালিকাসমূহ।

৫. **অস্থিমজ্জা (Bone marrow)** : অস্থি গহ্বরে অবস্থিত নরম ও চর্বিযুক্ত টিস্যু। লোহিত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা সৃষ্টির পাশাপাশি অস্থিমজ্জা B-কোষ, প্রাকৃতিক মারণকোষ, গ্রানুলোসাইট ও অপরিপক্ক থায়মোসাইট উৎপাদন করে।

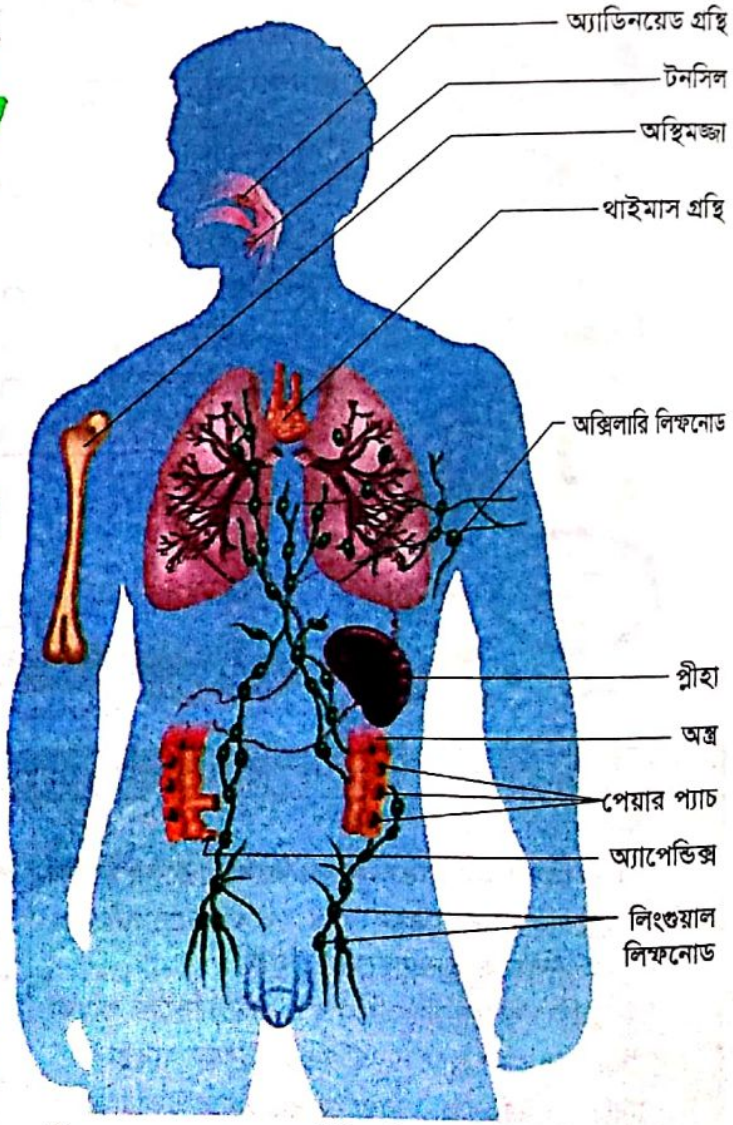

চিত্র ১০.১ : মানবদেহের বিভিন্ন লিম্ফয়েড অঙ্গ

৬. প্লীহা (Spleen) : উদর গহ্বরে বিদ্যমান লালচে বর্ণের মুষ্টি আকারের গঠন বিশেষ। একে রক্তের 'ইমিউনোলজিক্যাল ফিল্টার' বলে। এতে অসংখ্য লোহিত রক্তকণিকা, T-কোষ, B-কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ, NK-কোষ ও ম্যাক্রোফেজ থাকে। এটি দেহের সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থি।

৭. টনসিল (Tonsils) : গ্রীবার পিছনে অবস্থিত দুটি ডিম্বাকার গঠন বিশেষ।

৮. লসিকা গ্রন্থি (Lymph nodes) : দেহের সর্বত্র বিস্তৃত ছোট সিম আকৃতির গ্রন্থি যেগুলি লসিকানালি দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এদের অধিকাংশই T- কোষ, B-কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ ও ম্যাক্রোফেজ নিয়ে গঠিত।

৯. লসিকা নালি (Lymphatic vessels) : দেহের সর্বত্র বিস্তৃত নালিকা যেগুলি লসিকা পরিবহন করে।

১০. পেয়ার প্যাচ (Peyer's patches) : ক্ষুদ্রান্ত্রে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের লসিকা টিস্যু।

অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষসমূহ এবং এদের উৎপাদ (Immune Cells and Their Products)

দেহের যেসব কোষ অনাক্রম্যতন্ত্রের সাথে জড়িত সেগুলো হলো–

১. লিম্ফোসাইট (Lymphocytes) : লিম্ফোসাইট এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা। এগুলো অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কোষ। লিম্ফোসাইট অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে উদ্ভূত এবং থাইমাস ও অস্থিমজ্জায় বর্ধিত হয়। দেহে প্রবাহমান রক্তের শ্বেতকণিকার ২০% থেকে ৪০% এবং লিম্ফরসের প্রায় ৯৯% ই হলো লিম্ফোসাইট।

কাজের ধরন ও এদের কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী লিম্ফোসাইট প্রধানত দু'ধরনের। যথা: **T–কোষ ও B- কোষ**।

ক. T-কোষ (T-Cell) : যে সকল কোষ থাইমাসে বর্ধিত হয় তাদের T-কোষ বলে। T-কোষে বহু প্রকরণ রয়েছে এবং এরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। এক ধরনের T-কোষ মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটের সাথে সংযোগ রক্ষা করে এবং অন্তর্নিহিত অ্যান্টিজেন ধ্বংসে ফ্যাগোসাইট কোষকে সহায়তা করে। এদের প্রথম ধরনের সাহায্যকারী T-কোষ (Helper-1T-Cell) বলে। অন্যদিকে আর এক ধরনের T-কোষ B-কোষের সংযোগ রক্ষা করে বিভাজিত হয় এবং অ্যান্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করে। এরা দ্বিতীয় সাহায্যকারী T-কোষ (Helper-2T-Cell) নামে পরিচিত। এদের যথাক্রমে T_H1 ও T_H2 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আবার তৃতীয় এক ধরনের T-কোষ বাহকের অণুজীব সংক্রমিত কোষকে ধ্বংস করে। এ প্রতিক্রিয়াকে কোষ বিধ্বংস ক্রিয়া (cytotoxicity) বলে। এসব T-কোষকে সাইটোটক্সিক T-কোষ বলে এবং Tc দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

খ. B-কোষ (B-Cell) : অস্থিমজ্জায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লিম্ফোসাইটকে B-কোষ বলা হয়। এগুলো প্রধানত অ্যান্টিবডি উৎপাদনকারী কোষ। প্রতিটি B-কোষ সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত থাকে। অ্যান্টিবডি রক্তে প্রবাহিত অ্যান্টিজেনকে ঘিরে ফেলে এবং ধ্বংস করে। যখন কোনো B-কোষ অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয় তখন এটি আকারে অনেক বড় হয়। এ অবস্থায় একে প্লাজমাকোষ (plasma cell) বলে। প্রকৃতপক্ষে একটি প্লাজমা কোষ অ্যান্টিবডি উৎপাদনের কারখানা হিসেবে কাজ করে। একটি প্লাজমাকোষ থেকে লক্ষ লক্ষ অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় এবং রক্তে মিশে যায়।

প্রাকৃতিক মারণ বা ঘাতক কোষ (Natural killer Cell = NK Cell)

এগুলো বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট। এদের গঠন T-কোষের মতোই তবে এরা যে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করে। প্রাকৃতিক মারণকোষ থেকে সাইটোটক্সিন, পারফোরিন এবং গ্রানাইজাইম নিঃসৃত হয়ে সুনির্দিষ্ট কোষের আবরণীতে ছিদ্র সৃষ্টি করে। সুনির্দিষ্ট কোষের আবরণীর এসব ছিদ্র দিয়ে পানি প্রবেশ করে তা' স্ফীত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। প্রাকৃতিক মারণকোষসমূহের এরূপ নামকরণের কারণ হলো এরা কোষে বাহ্য-বিচারহীনভাবে ভাইরাস ধ্বংস করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

২. মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট (Mononuclear phagocytes) : ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলো দীর্ঘজীবী। এরা অস্থিমজ্জায় স্টেমকোষ থেকে তৈরি হয়। এরা দু'রকমের যথা– মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজ। অস্থিমজ্জায় স্টেমকোষ

থেকে উৎপন্ন হয়ে এসব শ্বেতকণিকা মনোসাইটরূপে রক্তে ঘুরে বেড়ায় এবং ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহে প্রবিষ্ট রোগ জীবাণুকে ভক্ষণ করে। জন্মের দু-তিন দিনের মধ্যে মনোসাইট রক্তস্রোত ত্যাগ করে বিভিন্ন টিস্যুতে চলে আসে এবং আকারে বড় হয়। তখন এদের ম্যাক্রোফেজ বলে। ম্যাক্রোফেজ কোষ বিভিন্ন রকমের হয়। যথা- যকৃতের কুফার কোষ, যোজক টিস্যুর হিস্টিওসাইট, অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ, অস্থির অস্টিওব্লাস্ট, যকৃতের মেসেঞ্জিয়াল কোষ, মস্তিষ্কের মাইক্রোগ্লিয়াল কোষ ইত্যাদি। ম্যাক্রোফেজ দেহের মৃতকোষ, আঘাতপ্রাপ্ত কোষ ও অন্যান্য বর্জ্য ভক্ষণ করে। এরা মনোকাইনস (monokines) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে যা অনাক্রম্যতার সাড়া দানে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৩. **দানাদার বা গ্রানুলার লিউকোসাইট (Granular leucocyte) :** গ্রানুলার লিউকোসাইট তিন প্রকার। যথা- নিউট্রোফিল (neutrophil), ইওসিনোফিল (eosionophil) ও বেসোফিল (basophil)। এরা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে জীবাণু ধ্বংস করে।

৪. **মাস্টকোষ (Mast cell) :** ত্বক, নাক, জিহ্বা, ফুসফুস ও অন্ত্রের অন্তঃআবরণ ইত্যাদিতে মাস্টকোষ থাকে। এরা দেহে অ্যালার্জি সৃষ্টির জন্য দায়ী।

৫. **অণুচক্রিকা (Thrombocyte) :** রক্তে বিদ্যমান বর্ণহীন ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসবিহীন, গোলাকার বা ডিম্বাকার বা দণ্ডাকার রক্ত কণিকাকে অণুচক্রিকা বলে। এরা অস্থিমজ্জায় মেগাক্যারিওসাইট থেকে উৎপন্ন হয়। এদের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন ও ফসফোলিপিড। এরা কোষ প্রদাহ নিয়ন্ত্রণকারী যৌগ (inflammatory mediator) ক্ষরণ করে এবং রক্ত তঞ্চনের পাশাপাশি অনাক্রম্যতন্ত্রের কিছু অংশকে সক্রিয় করে তোলে।

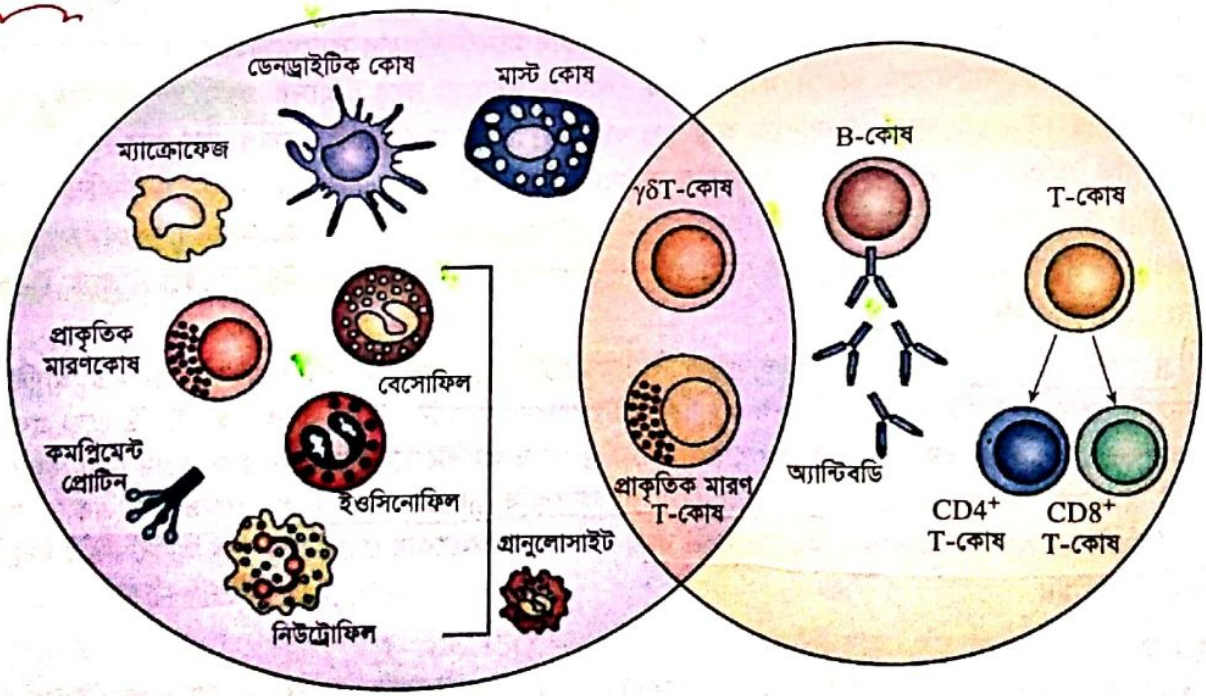

চিত্র ১০.২ : মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কোষ

৬. **ডেনড্রাইটিক কোষ (Dendritic cell) :** এ ধরনের কোষগুলো দেহের বিভিন্ন অংশে থাকে। যেমন- ত্বকে ও মিউকাস পর্দায় ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ (Langerhans cell), থাইমাস গ্রন্থির মেডুলার ইন্টারডিজিটেটিং ডেনড্রাইটিক কোষ (interdigitating dendritic cell), ফুসফুস, যকৃত ও হৃৎপিণ্ডে ইন্টারস্টিশিয়াল ডেনড্রাইটিক কোষ (interstitial dendritic cell)। দেহ রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে এসব কোষ এক ধরনের সতর্ক সংকেত পাঠায় যাতে অনাক্রম্যতন্ত্র সাড়া প্রদান করে।

T- কোষ এবং B-কোষের মধ্যে পার্থক্য	
T-কোষ	**B-কোষ**
১. এরা দেহে কোষ-নির্ভর ইমিউনিটি সৃষ্টি করে।	১. এরা দেহে রস-নির্ভর ইমিউনিটি সৃষ্টি করে।
২. এরা থাইমাস গ্রন্থিতে পরিণতি লাভ করে।	২. এরা বারসাল লিম্ফয়েড অঙ্গে পরিণতি লাভ করে।
৩. T-কোষ কর্তৃক সরাসরি জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের নিয়ন্ত্রণ ঘটে।	৩. প্লাজমা B-কোষ সৃষ্ট অ্যান্টিবডির দ্বারা জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের নিয়ন্ত্রণ ঘটে।
৪. নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে T-কোষ বিভাজিত হয়ে একটি ক্লোন তৈরি করে যাতে কিলার T-কোষ, হেলপার T-কোষ, সাপ্রেসর T-কোষ এবং মেমোরি T- কোষ থাকে।	৪. নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে B-কোষ বিভাজিত হয়ে একটি ক্লোন তৈরি করে যাতে প্লাজমা কোষ ও মেমোরি B-কোষ থাকে।
৫. এরা ক্যান্সার কোষ এবং প্রতিস্থাপিত টিস্যুর কোষ ধ্বংস করতে পারে।	৫. এরা ক্যান্সার কোষ এবং প্রতিস্থাপিত টিস্যু কোষ ধ্বংস করতে পারে না।
৬. দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার উপর সাপ্রেসর T-কোষের অবদমনমূলক প্রভাব আছে।	৬. দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার উপর এদের কোনো অবদমনমূলক প্রভাব নেই।

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Defense Mechanism of Human Body)

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত দু'প্রকার। যথা- অনির্দিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অনির্দিষ্ট বা নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Non specific defence system) : এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেহ যেকোনো রকম অণুজীব বা জীবাণু প্রবেশকে বাঁধা দান করে অথবা প্রবেশকারী জীবাণুকে ধ্বংস করে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেহ একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলা হয় কারণ এদের জীবাণু সুনির্দিষ্ট নয় অর্থাৎ যে কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

২. সুনির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Specific defence system) : এটি এমন একটি সক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দেহে প্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট জীবাণুকে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের দ্বারা ধ্বংস করে অথবা আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে।

রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে মানবদেহ ৩টি প্রতিরোধ কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। প্রত্যেকটি কৌশলকে একেকটি প্রতিরক্ষা স্তর (line of defence) নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি ব্যবস্থা ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হিসেবে সদা সর্তক রয়েছে। মানবদেহের ৩টি প্রতিরক্ষা স্তর (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) নিচে উল্লেখ করা হলো।

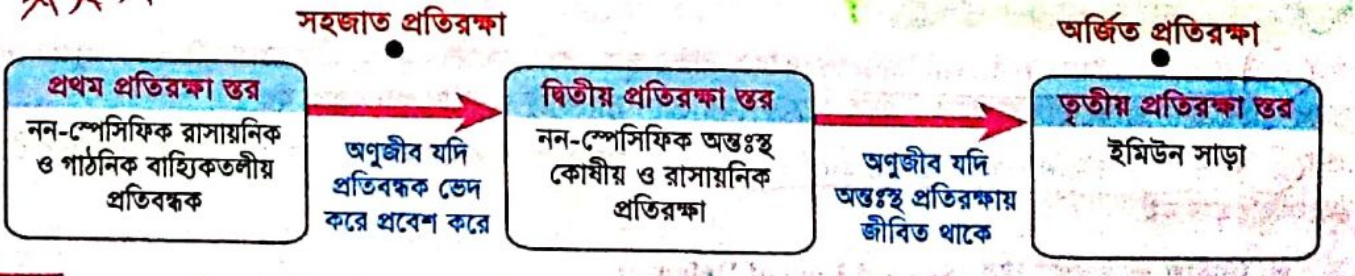

ক. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর (First Line of Defense)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় যে প্রতিরক্ষা স্তর রাসায়নিক ও ভৌত বাহ্যিকতলীয় প্রতিবন্ধক (chemical and physical surface barriers) হিসেবে বহিরাগত যে কোনো অণুজীব বা কণাকে দেহের ভিতরে প্রবেশে বাধা দেয় তাকে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বলে। এ প্রতিরক্ষা স্তর কোনো নির্দিষ্ট বহিরাগত বস্তুকে ক্ষতিকর হিসেবে টার্গেট না করে সব বহিরাগত

পদার্থকেই ক্ষতিকর বিবেচনা করে দেহে প্রবেশে নিম্নোক্ত ভৌত-রাসায়নিক প্রতিবন্ধকের মিলিত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই এ স্তরটি নন-স্পেসিফিক (non-specific) স্তর নামে পরিচিত।

১. **ত্বক (Skin/Integument; integere = to cover) :** ত্বক চারভাবে একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে: (i) গাঠনিকভাবে কেরাটিনময়, বায়ুরোধী, জলাভেদ্য (waterproof) ও অধিকাংশ পদার্থের প্রতি অভেদ্য; (ii) সবসময় প্রতিস্থাপিত হয়; (iii) এসিডিক pH; এবং (iv) ঘামগ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি

২. **লোম (Hairs) :** নাকের ভিতরকার লোম ধূলা-ময়লা আটকে দেহের অভ্যন্তরে ক্ষতিকর পদার্থের যাতায়াত বন্ধ করে রাখে।

৩. **সিলিয়া (Cilia) :** দেহের প্রবেশ পথগুলো মিউকাস ঝিল্লি (mucous membrane)-তে আবৃত থাকে। মিউকাস ঝিল্লিময় অনেক অংশ (যেমন– শ্বাসনালি) আণুবীক্ষণিক ও সদা বহির্মুখী আন্দোলনরত সিলিয়ায় আবৃত থাকে। বহিরাগত কণা ও অণুজীব এ ঝিল্লির আঠালো মিউকাসে আটকে দলা পাকিয়ে হাঁচি-কাশি-থুথু হিসেবে বহির্গত হয় কিংবা পাকস্থলিতে এসে পৌছায়।

৪. **অশ্রু ও লালা (Tears and Saliva) :** অশ্রু ও লালা আমাদের অজান্তে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অশ্রু ও লালায় যে লাইসোজাইম (lysozyme) এনজাইম রয়েছে তা ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। লালা মুখগহ্বরকে শুধু সিক্ত ও পিচ্ছিল রাখে না, গহ্বরের প্রাচীর যেন শুকিয়ে ফেটে না যায় সে কাজও করে। এ কারণে কেনো জীবিত ব্যাকটেরিয়া মুখের ক্ষতি করতে পারে না। বরং লালামিশ্রিত হয়ে সরাসরি পাকস্থলিতে পৌছে আরও শক্তিশালী এসিডের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়। চোখকে বারংবার ভিজিয়ে দিয়ে অশ্রু বহিরাগত কণা ও অণুজীবের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

৫. **সেরুমেন (Cerumen or Ear wax) :** বহিঃকর্ণের কর্ণকূহর নামক অংশের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হলদে-বাদামি রংয়ের মোমের মতো পদার্থকে সেরুমেন বলে। কানের পর্দায় যেন ময়লা ও অণুজীবের সংক্রমণে শ্রবণে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য সেরুমেনে আটকে শক্ত দলায় অর্থাৎ কানের **খইল**–এ পরিণত হয়।

৬. **পৌষ্টিকনালির এসিড (Acid of Alimentary Canal) :** খাদ্য ও পানির সঙ্গে অনেক ধরনের ক্ষতিকর অণুজীব পাকস্থলিতে এসে জমা হয় এবং পাকস্থলির শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়।

৭. **রেচন-জননতন্ত্রের এসিড (Urinogenital Acid) :** রেচন-জননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গের ক্ষরণ প্রচন্ড এসিডিক ও আঠালো হয়ে থাকে। অনুপ্রবেশিত অণুজীব সহজেই আঠালো ক্ষরণে আটকে যায় এবং পরে ফ্যাগোসাইট এগুলোকে গ্রাস করে বা মূত্রত্যাগের সময় সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়। যোনিতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড ক্ষরণ করে অন্য অণুজীবের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৮. **মাইক্রোবায়োম (Microbiome) :** দেহের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বন্ধু অণুজীব রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবদের সাথে পুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা করে। এতে অনেকসময় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৯. **মলত্যাগ ও বমি (Defecation and Vomiting) :** মলত্যাগ ও বমির মাধ্যমে অসংখ্য ক্ষতিকর অণুজীব দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

খ. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Second Line of Defense)

বাহ্যিকতলীয় প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী যে কোনো অণুজীব বা অণুকণার বিরুদ্ধে দেহাভ্যন্তরীণ কোষীয় ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা (internal cellular and chemical defenses) নিয়ে গঠিত যে স্তর সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাকে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলে। এটিও একটি নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা স্তর। নিচে বর্ণিত অন্ততঃ ৬ ধরনের নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতি নিয়ে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর গঠিত।

১. **ফ্যাগোসাইট (Phagocytes) :** বড় আকারের শ্বেত রক্তকণিকা যা অণুজীব, অন্য কোষ ও বহিরাগত কণা ভক্ষণ করে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখে তাকে ফ্যাগোসাইট বলে। দুটি প্রধান ফ্যাগোসাইটিক কণিকা হচ্ছে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ। এগুলো অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। দেহে জীবাণুর সংক্রমণ হলে তার প্রতি সাড়াদান হিসেবে নিউট্রোফিল রক্তে, আর ম্যাক্রোফেজ নির্দিষ্ট টিস্যুতে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু গ্রাস করে। শুধু জীবাণু গ্রাস ও হজম করাই নয়, ম্যাক্রোফেজ পুরনো রক্তকণিকা, মৃত টিস্যু-খন্ড ও কোষীয় ময়লা গ্রাস করে ধাঙ্গর কোষ হিসেবে কাজ করে।

২. **সহজাত মারণকোষ (Natural killer cells, সংক্ষেপে NK-cells) :** এক ধরনের লিম্ফোসাইট জাতীয় বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা যা টিউমার কোষ ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষের প্লাজমাঝিল্লিতে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তনকে শনাক্ত করে কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয় সেসব কোষকে সহজাত মারণকোষ (NK-কোষ) বলে। এগুলো নন-স্পেসিফিক মারণকোষ (non-specific killer cells)। NK-কোষ ফ্যাগোসাইট নয়, বরং রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে নির্দিষ্ট কোষের প্লাজমাঝিল্লি নষ্ট করে দেয়। NK-কোষের আক্রমণে দ্রুত টার্গেট কোষের ঝিল্লিতে একটি রন্ধ্রের সৃষ্টি হয় এবং নিউক্লিয়াসটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

৩. **প্রদাহ (Inflammation) :** টিস্যুর যে কোনো ধরনের ক্ষতি হলে (যেমন– সংক্রমণজনিত দহন, যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক বা আঘাতজনিত দৈহিক ক্ষত ইত্যাদি) যে ধারাবাহিক ঘটনার শুরুতে– (i) ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায়, (ii) পরে গরম হয়, (iii) ফুলে যায় এবং (iv) সবশেষে ব্যথার প্রকাশ ঘটায় তাকে সম্মিলিতভাবে প্রদাহ-সাড়া (inflammatory response) বা প্রদাহ বলে।

রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। হিস্টামিনের উপস্থিতির জন্য কৈশিকনালির প্রাচীর বেশি ভেদ্য হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাচীর ভেদ করে অসংখ্য নিউট্রোফিল ও অনেক উপকারী উপাদানসহ (যেমন - রক্তজমাটের ফ্যাক্টর, O_2 ও পুষ্টি পদার্থ ইত্যাদি) তরল পদার্থ রক্তপ্রবাহে মুক্ত হয়। ফলে ক্ষতস্থান ফুলে উঠে। নিউট্রোফিল রোগ সৃষ্টির জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ ও মৃতকোষ ভক্ষণ শুরু করে। তখন ম্যাক্রোফেজ আবির্ভূত হয়ে দ্রুত এসব পদার্থের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতি আক্রমণে নিযুক্ত হয়।

৪. **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বা কমপ্লিমেন্ট (Complement system or Complement) :** কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে অন্ততঃ ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি গ্রুপ যা রক্তে সংবহিত হয়ে অন্যান্য প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সহায়তা করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব প্রোটিন নিষ্ক্রিয়ভাবে সংবহিত হয়। একবার যদি কোনো প্রোটিন সক্রিয় হয়ে উঠে তাহলে তা আরেকটি প্রোটিনকেও সক্রিয় করে তুলে। এভাবে সমস্ত প্রোটিন পরস্পরকে সক্রিয় করে স্পেসিফিক ও নন-স্পেসিফিক উভয় ধরনের প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে উসকে দেয়। ফলশ্রুতিতে NK-কোষ দক্ষতার সঙ্গে টিউমার কোষ ধ্বংস করে; নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ দ্রুত ক্ষতস্থানে পৌছায়; অণুজীবের গায়ে কমপ্লিমেন্ট আটকে থেকে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে কোষভক্ষণে সহযোগিতা করে (চিনিয়ে দেয়); এবং রক্তবাহিকার প্রসারণ ঘটিয়ে প্রদাহ ত্বরান্বিত করে।

৫. **ইন্টারফেরন (Interferon) :** ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আক্রান্ত কোষ থেকে যে বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্র গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয় তাকে ইন্টারফেরন বলে। ইন্টারফেরন ব্যাপিত হয়ে আশপাশের সুস্থ কোষে ছড়িয়ে পড়ে, ঐসব কোষের ঝিল্লিতে যুক্ত হয় এবং সুস্থ কোষগুলোকে এ ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষে উদ্দীপ্ত করে, ফলে ভাইরাসের পক্ষে অন্য সুরক্ষিত কোষগুলোতে আক্রমণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইনফেরন ক্ষরণ অন্যতম নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা স্তর। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য যেহেতু জীবিত কোষের প্রয়োজন হয় তাই সজীব কোষগুলো দ্রুত সাড়া দিয়ে ইন্টারফেরনের সুরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলে।

৬. **জ্বর (Fever) :** দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের শেষ অস্ত্র হচ্ছে জ্বর। দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের (97—99°F অর্থাৎ 36–37.2°C) চেয়ে বেশি হলে তাকে জ্বর বলে। ম্যাক্রোফেজ যখন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা বহিরাগত কণাকে শনাক্ত ও আক্রমণ করে তখন কোষগুলো রক্তপ্রবাহে পাইরোজেন (pyrogen) নামক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে। পাইরোজেন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের তাপমাত্রাকে উচ্চতর মাত্রায় নির্ধারণ করায়। তখন শরীর কেঁপে উঠে ও জ্বর আসে। জ্বরমাত্রই ক্ষতিকর নয়। কম বা মাঝারি ধরনের জ্বর (102 — 104°F) দেহের উপকারই

করে। এমন জ্বরে দেহের ভিতরে জীবাণু তেমন সুবিধা পায় না, বরং সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের যুদ্ধ করার সক্ষমতা বেড়ে যায়। জ্বর হলে দেহকোষের বিপাকীয় হার বেড়ে যায়, প্রতিরক্ষা পদ্ধতি ও টিস্যুর ক্ষয়পূরণ দ্রুততর হয়। জ্বরশেষে ম্যাক্রোফেজগুলো পাইরোজেন ক্ষরণ বন্ধ করে দেয়, দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে। যে জ্বর দুদিনের বেশি স্থায়ী হয়, কিংবা ১০০°এ ছাড়িয়ে যায় তখনই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

গ. তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third Line of Defense)

যে প্রতিরক্ষা স্তর দেহে অনুপ্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট ধরনের বহিরাগত রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণা বা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে এবং প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পর এসব নির্দিষ্ট ক্ষতিকর টার্গেটকে আজীবন মনে রেখে পরবর্তী যে কোনো আক্রমণের সময় দ্রুত ও কার্যকর সাড়া দেয় তাকে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলে। এ স্তরের সামগ্রিক কর্মকান্ডটি ইমিউন সাড়া (immune response) নামে পরিচিত।

বহিরাগত অণুজীব বা কণা কোনোভাবে ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে (অর্থাৎ সমস্ত নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা পেরিয়ে) দেহে অনুপ্রবিষ্ট হলে প্রতিরক্ষা স্তরের সর্বোত্তম, সক্রিয়, শক্তিশালী ও স্থায়ী অনাক্রম্য সাড়ার সম্মুখীন হয়। এ সাড়া নিম্নোক্ত ৩টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত :

১. বহিরাগত অণুজীব বা কণা শনাক্ত করে টার্গেটে পরিণত করতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যবান কোষকে অসুস্থ (যেমন– ক্যান্সার কোষ) বা মৃতপ্রায় বা মৃতকোষ থেকে পৃথক করতে পারে।

২. বহিরাগত অণুজীব বা কণার সংক্রমণ 'স্মৃতি'তে ধরে রেখে বছরের পর বছর নির্দিষ্ট বহিরাগতের অনুপ্রবেশ দ্রুত ঠেকানোর চেষ্টা করে।

৩. এটি সমগ্র দেহকে রক্ষা করে এবং অনুপ্রবেশকারী উদ্ভূত অনাক্রম্যতা দেহের নির্দিষ্ট অংশে কার্যকর না থেকে শরীরের যে কোনো অংশে কার্যকর হতে পারে।

*** মানবদেহের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের মধ্যে পার্থক্য

প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর	দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর	তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
১. এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেহে জীবাণুর অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্থ করে।	এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেহে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুর প্রতিষ্ঠা লাভ অ্যান্টিবডির মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বাধাগ্রস্থ করে।	এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেহে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুর প্রতিষ্ঠা লাভ লিম্ফোসাইট বা অ্যান্টিবডির কার্যাদি দ্বারা বাধাগ্রস্থ করে।
২. এটি সহজাত ইমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্কিত।	এটিও সহজাত ইমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্কিত।	এটি অর্জিত ইমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্কিত।
৩. এটি জন্মগতভাবে প্রাপ্ত।	এটিও জন্মগতভাবে প্রাপ্ত।	এটি জন্মের পর নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রভাবে সৃষ্ট।
৪. এটি নন-স্পেসিফিক অর্থাৎ বিশেষ কোনো জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের প্রতি সুনির্দিষ্ট নয়।	এটিও নন-স্পেসিফিক অর্থাৎ বিশেষ কোনো জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের প্রতি সুনির্দিষ্ট নয়।	এটি স্পেসিফিক অর্থাৎ জীবাণু বা অ্যান্টিজেনের প্রতি সুনির্দিষ্ট।
৫. এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান হলো- i. ত্বক ii. লোম iii. সিলিয়া iv. কানের মোম (সেরুমেন) v. অশ্রু, শ্লেষ্মা ও লালা vi. পাকস্থলির এসিড ও এনজাইম vii. রেচন ও জনন অঙ্গের এসিড viii. মাইক্রোবায়োম ix. মলত্যাগ ও বমি	এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান হলো- i. ফ্যাগোসাইটস ii. প্রাকৃতিক মারণ কোষ iii. কমপ্লিমেন্টতন্ত্র iv. সাইটোকাইনস v. ইন্টারফেরন vi. অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন vii. প্রদাহ viii. জ্বর ix. রক্ত তঞ্চন	এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপাদান হলো- i. লিম্ফোসাইট ii. অ্যান্টিবডি iii. স্মৃতিকোষ

CamScanner

দেহের প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর)

(Role of Skin in Defense of the Body)

মানবদেহকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথমে দরকার দেহে জীবাণুর প্রবেশ বন্ধ করা। একাজে প্রতিবন্ধক হিসেবে **ত্বক** (skin) অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ কারণে **প্রথম সারির প্রতিরক্ষক হিসেবে ত্বক সুপরিচিত**। এটি অন্যতম **নন-স্পেসিফিক** (non-specific) **বহিঃস্থ প্রতিবন্ধক**। যে প্রতিবন্ধক কোনো জীবিত বস্তুকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত না করতে পেরে তাকে জীবাণু মনে করে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে ধরনের প্রতিবন্ধককে **অনির্দিষ্ট** বা **নন-স্পেসিফিক প্রতিবন্ধক** বলে। নিচে দেহের প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. ত্বকের বাইরের স্তরটি এপিডার্মিস (epidermis)। এটি একটি হর্ণি স্তর যা মৃত ও চাপা কোষে গঠিত এবং **স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম** (stratum corneum) নামে পরিচিত। এটি জীবাণুরোধী স্তর এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের প্রবেশে **ভৌত প্রতিবন্ধক** (physical barrier) হিসেবে কাজ করে। কতকগুলো ভাইরাস ছাড়া এমন কোনো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নেই যা অক্ষত ত্বকের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

২. মানবত্বকে অক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই থাকে, কিন্তু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সেখানে বাঁচতে পারে না। কারণ ত্বকের **স্বেদ বা সিবেসাস গ্রন্থি** (sebaceous gland) ও **ঘাম গ্রন্থি** (sweat gland) থেকে যথাক্রমে যে **তেল** (বা স্বেদ) ও **ঘাম** ক্ষরিত হয় তা ত্বককে এসিডিক (pH 3.0-5.0) করে তুলে। এমন পরিবেশে জীবাণু বাঁচতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, ত্বকে যে সব অক্ষতিকর বা উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলোও যে এসিড ও বিপাকীয় বর্জ্য ত্যাগ করে সে সব পদার্থও ত্বকের উপরে ব্যাকটেরিয়া দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। স্বেদ ও ঘাম গ্রন্থির ক্ষরণেও জীবাণুনাশক (অ্যান্টিবায়োটিক) পদার্থ থাকে (যেমন –ডার্মিসাইডিন নামে পেপটাইড)। এসব পদার্থ থাকায় মানুষের ত্বক **আত্ম-রোগজীবাণুনাশক অঙ্গ** (self-disinfecting organ) হিসেবে কাজ করে।

৩. মানুষের দেহগাত্রে স্বাভাবিকভাবে বসবাসরত ব্যাকটেরিয়া অন্যান্য অণুজীবের সংক্রমণ আশঙ্কা থেকে দেহকে রক্ষা করে। যেমন–যোনিতে যে ব্যাকটেরিয়া বাস করে তা ল্যাকটিক এসিড ক্ষরণ করে pH মাত্রা কমিয়ে দেয়। কেউ অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলে এসব ব্যাকটেরিয়া মারা যেতে পারে, ফলে যোনিদেশে pH বেড়ে যায়। এ সুযোগে সেখানে *Candida* বা অন্যান্য অণুজীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে ক্ষতরোগের সৃষ্টি করে।

৪. ত্বক কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ ও অভ্যন্তরীণ টিস্যুতে সংক্রমণের আশংকা বহুগুণ বেড়ে যায়। কাটা স্থান দিয়ে নির্গত রক্ত জমাট বেঁধে শুধু যে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে তাই না, বাইরে থেকে অণুজীব প্রবেশেও বাধা দেয়। দ্রুত ও আপদকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এ প্রাকৃতিক চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকর।

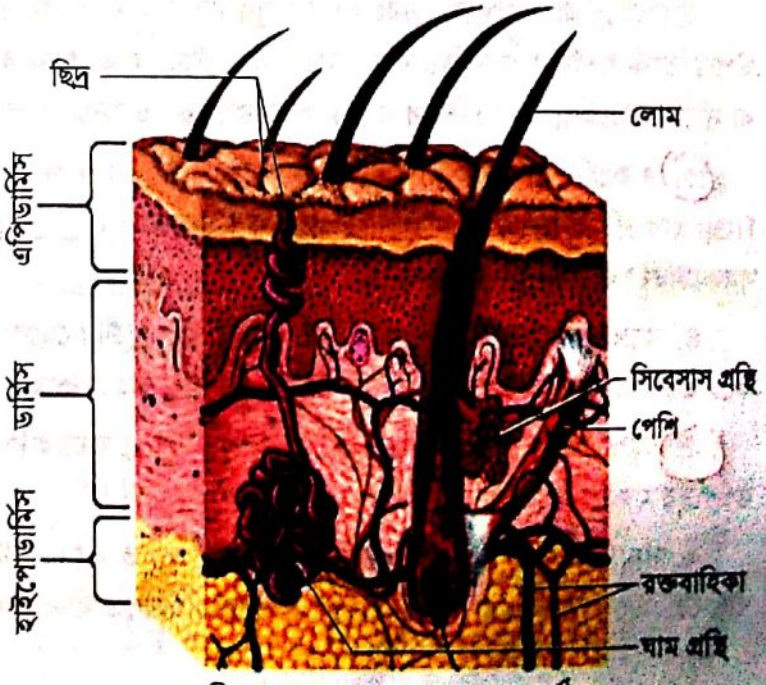

চিত্র ১০.৩ : মানুষের ত্বকের অন্তর্গঠন

৫. দেহের সিক্ত অংশগুলো সবসময় কোনো না কোনো ব্যাকটেরীয় সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে। অনেক অংশ আবার ব্যাকটেরিয়ানাশকও বহন করে, যেমন–অশ্রু, নাসিকাঝিল্লি ও লালায় লাইসোজাইম (lysozyme); সিমেনে স্পার্মিন (spermin); দুধে ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ (lactoperoxidase) ইত্যাদি।

৬. কানের ভিতরে সিরুমিনাস গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত সিরুমেন (cerumen) বা কানের মোম কানের গভীরে ধূলা-বালি, ব্যাকটেরিয়া ও ছোট পোকার প্রবেশ প্রতিরোধ করে। সিরুমিনাস গ্রন্থি কর্ণকুহরে এক ধরনের ত্বকীয় গ্রন্থি।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর)
(Role of Digestive Acid and Enzyme in the Destruction of Bacteria in Food)

আমরা প্রতিনিয়ত অসংখ্য ধরনের ব্যাকটেরিয়া (ও ভাইরাস)-র মুখোমুখি হচ্ছি। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, খাদ্যের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ। বাঁচার জন্যে আহার করি, কিন্তু তা যদি ব্যাকটেরিয়া যুক্ত হয় তাহলে জীবনধারণই অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিছু ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই খাদ্যবাহিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে বলে আমরা তা টেরও পাই না।

নাসিকা-গহ্বর, গলবিল ও ট্রাকিয়ার মিউকাসঝিল্লি যে **মিউকাস** (mucous) ক্ষরণ করে তাতে লাইসোজাইম (lysozyme) নামে এক ধরনের প্রোটিন থাকে যা ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। ট্রাকিয়ার মিউকোসা শুধু মিউকাসই ক্ষরণ করে না, এর প্রাচীর সিলিয়াময়ও বটে। সিলিয়া থাকায় ধূলা-বালি বা বহিরাগত বস্তু প্রবেশে বাধা পায়, সিলিয়ায় আটকা পড়ে এবং সিলিয়ার বহির্মুখি আন্দোলনে ব্যাকটেরিয়া মিউকাস মিশ্রিত হয়ে গলবিলে এসে পড়ে। গলবিল হয়ে এসব ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলিতে পৌছালে গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর ক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে যায়।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও বিভিন্ন এনজাইম নিচে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১. লালাগ্রন্থিতে **লাইসোজাইম** নামে এক ধরনের এনজাইম থাকে। এটি মুখ ও গলায় সংক্রমণকারী *Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়াসহ অনেক ধরনের জীবাণু ধ্বংস করে। ব্যাকটেরিয়ার পলিস্যাকারাইড-নির্মিত কোষপ্রাচীর বিগলিত করে এদের বিনষ্ট করে।

২. লাইসোজাইম, লালা এবং লালায় অবস্থিত সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন (এটি দাঁতে এসিডের উপস্থিতিকে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করে) মিলে দাঁত ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। লালারসের অবিরাম ক্ষরণে মুখের ভিতরে বা দাঁতে খাদ্যকণা জমতে পারে না, ফলে ব্যাকটেরিয়াও জন্মাতে পারে না।

৩. পাকস্থলি প্রাচীরের প্যারাইটাল বা অক্সিনেটিক কোষ-ক্ষরিত **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice)-এ বিপুল পরিমাণ HCl পাকস্থলির অভ্যন্তরে শক্তিশালী **এসিডিক মাধ্যম** (pH 1.0–2.0) সৃষ্টি করে। এসিডিক মাধ্যম খাদ্যে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করে।

৪. অন্ত্রে বসবাসকারী কয়েক ধরনের মিথোজীবী অণুজীব থেকে ক্ষরিত অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং খাদ্যবাহিত কয়েক ধরনের ভাইরাসের বৃদ্ধি রহিত করে।

৫. যকৃত থেকে ক্ষরিত পিত্ত (ক্ষারীয় রস pH ৮.০) অন্ত্রের ডিওডেনামে অবস্থিত **কাইম** (chyme)-এ অ্যান্টিবডি উৎপন্নের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত করে।

৬. সমগ্র পৌষ্টিকনালির অন্তঃপ্রাচীর মিউকাসে আবৃত থাকে। মিউকাসে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক রয়েছে যা ব্যাকটেরিয়াকে ঘিরে ধরে এবং প্রাচীরগাত্রে আটকে থাকতে বাধা দেয়।

CamScanner

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল-এর ভূমিকা (দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর)
(Role of Macrophages and Neutrophils in Destroying Bacteria)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় সদা ব্যস্ত বিভিন্ন শ্বেত রক্তকণিকা ও রক্তবাহিকা মিলে **দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষক** হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিরক্ষা স্তরকে **নন-স্পেসিফিক অন্তঃস্থ প্রতিবন্ধক** বলে। প্রথম স্তর পেরিয়ে দেহের ভিতরে প্রবেশ করলে জীবাণুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে দ্বিতীয় স্তর। এ স্তর টিস্যু, রক্তবাহিকা এবং ফ্যাগোসাইট ও লিম্ফোসাইট নিয়ে গঠিত।

দেহে প্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে দুধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: ১. ম্যাক্রোফেজ ও ২. নিউট্রোফিল। নিচে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এদের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

১) ম্যাক্রোফেজ (Macrophage : গ্রিক *makros* = large : *phagein* = eat, অর্থাৎ big eaters)

মনোসাইট হচ্ছে বৃক্কাকার ও দানাহীন সাইটোপ্লাজমবিশিষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা। দেহের মোট শ্বেত-রক্তকণিকার ৪ শতাংশ মনোসাইট। অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এসব কোষ ১০-২০ ঘন্টা রক্তে সংবহিত হওয়ার পর কৈশিকনালির প্রাচীরের ভিতর দিয়ে টিস্যুতে অভিযাত্রী হয়ে ফুলতে শুরু করে এবং প্রায় ৫ গুণ বড় হয়ে ৬০-৮০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়। পরিণত এ মনোসাইটকে **ম্যাক্রোফেজ** বলে। কিছু ম্যাক্রোফেজ সারা শরীরে পরিভ্রমণ করে, অন্যগুলো স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট টিস্যুতে (যেমন- ফুসফুস, যকৃত, বৃক্ক, যোজক টিস্যু, মস্তিষ্ক ও বিশেষ করে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহা) অবস্থান নেয়। প্রয়োজনে এখানে ম্যাক্রোফেজ ৪০ মাইক্রোমিটার / মিনিট গতিতে ক্ষণপদীয় চলনের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয় এবং বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত জীবিত থাকে।

ম্যাক্রোফেজ দেহে প্রবিষ্ট বিজাতীয় পদার্থের প্রতি ইমিউন সাড়াদানে মূল ভূমিকা পালন করে। তখন মনোসাইটগুলো টিস্যুতে অভিযাত্রী হয়ে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়। ম্যাক্রোফেজের উপস্থিতি দেখেই ধারণা করা যায় যে দেহে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইমিউনতন্ত্রের মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ম্যাক্রোফেজ নিউট্রোফিলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ফ্যাগোসাইট হিসেবে কাজ করে। তখন একেকটি ম্যাক্রোফেজ প্রায় ১০০টির মতো ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করতে পারে, কখনওবা সম্পূর্ণ লাল-রক্তকণিকা, ছত্রাক বা ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মতো বড় পদার্থও গ্রাস করে। ম্যাক্রোফেজ এসব পদার্থ গ্রহণ ও পরিপাক শেষে অপাচ্য অংশ বহিষ্করণের পরও অনেক সময় জীবিত থাকে এবং আরও কয়েক মাস সক্রিয় থাকে। **সাইটোকাইন** (cytokine) নামক রাসায়নিক বার্তাবাহক ক্ষরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কোষকে একত্রিত করে ক্ষত নিরাময়ে ভূমিকা পালন করে।

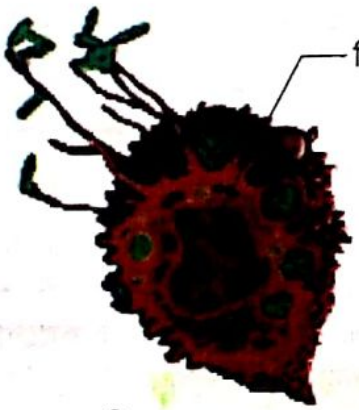

চিত্র ১০.৪ : ম্যাক্রোফেজ

চিত্র ১০.৫ : নিউট্রোফিল

২. নিউট্রোফিল (Neutrophils)

নিউট্রোফিল হচ্ছে ১২-১৫ মাইক্রোমিটার ব্যাসসম্পন্ন, ২-৫ খন্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত (খন্ডগুলো পরস্পরের সাথে সূক্ষ্ম তন্তুর সাহায্যে যুক্ত) ও সূক্ষ্ম দানাময় সাইটোপ্লাজমবিশিষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা। দেহের মোট শ্বেত রক্তকণিকার ৬০-৭০ শতাংশই নিউট্রোফিল। এসব কণিকা ক্ষণপদীয় চলন প্রদর্শন করে (৪০ মাইক্রোমিটার/মিনিট)। এরা অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয়। একজন স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষে দৈনিক প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) নিউট্রোফিল উৎপন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে পরিণত নিউট্রোফিলে রূপ নেয়। এগুলো ক্ষণস্থায়ী রক্তকণিকা, রক্ত

প্রবাহে প্রবেশের পর ১২ ঘন্টা থেকে ৩ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে টিস্যুতে প্রবেশ করলে কিছুদিন বেশি বাঁচে। কণিকাগুলো যেহেতু ক্ষণজীবী তাই দেহের সুরক্ষায় কখন এসব কণিকার প্রয়োজন পড়ে সে কারণে বিপুল সংখ্যক নিউট্রোফিল অস্থিমজ্জায় সব সময় মজুদ থাকে। অস্থিমজ্জার বাইরে সংবহিত ১০০ বিলিয়ন নিউট্রোফিলের মধ্যে অর্ধেক থাকে টিস্যুতে, বাকি অর্ধেক রক্ত বাহিকায়। যেগুলো রক্তবাহিকায় থাকে তার অর্ধেক থাকে মূল ও দ্রুত রক্তস্রোতে, বাকি অর্ধেক চলে ধীরে সুস্থে রক্তবাহিকার অন্তপ্রাচীর ঘেঁষে (সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন টিস্যুতে প্রবেশ করতে পারে)।

নিউট্রোফিল হচ্ছে সক্রিয় ফ্যাগোসাইটিক শ্বেত রক্তকণিকা। এগুলো বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা যে কোনো আণুবীক্ষণিক প্রোটিন কণা গ্রাস করে নেয়। কণিকার অভ্যন্তরে লাইসোজোম যে সক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ধারণ করে রাখে তার সাহায্যে গৃহীত বস্তু ধ্বংস করে। নিউট্রোফিলের পক্ষে ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে বড় পদার্থকে গ্রাস করা সম্ভব হয় না। একটি নিউট্রোফিল ৩–২০ টি ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করতে পারে। এরপর সেটি নিজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে মৃত্যুবরণ করে

ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলের মধ্যে পার্থক্য

ম্যাক্রোফেজ	নিউট্রোফিল
১. বিশেষ ধরনের অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা।	১. দানাদার শ্বেত রক্তকণিকা।
২. মনোসাইট রক্তের বাইরে বৃহদাকার ধারণ করে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়।	২. নিউট্রোফিল কোনো রক্তকণিকার পরিবর্তিত রূপ নয়।
৩. এরা B ও T- লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম।	৩. এরা সক্ষম নয়।
৪. এরা সাধারণত ২টি প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। যথা- ভৌত ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়।	৪. এরা সাধারণত ৩টি প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। যথা- ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়, প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দ্বারা এবং ভৌত প্রক্রিয়ায়।

ফ্যাগোসাইটোসিস

(Phagocytosis : গ্রিক *phagein* = to eat; *kytos* = cell; *oisis* = process : কোষভক্ষণ প্রক্রিয়া)

যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা দেহরক্ষার অংশ হিসেবে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে দেহে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি) বা টিস্যুর মৃতকোষ ও অন্যান্য বহিরাগত কণাকে গ্রাস ও এনজাইমের সাহায্যে ধ্বংস করে দেহকে আজীবন সুস্থ রাখতে সচেষ্ট থাকে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে। ইমিউনতন্ত্রের প্রধানতম কাজ হচ্ছে সমন্বিত ও কার্যকর ফ্যাগোসাইটোসিস চালু রাখা।

ফ্যাগোসাইটোসিসের ধাপসমূহ (Steps of Phagocytosis)

সম্পূর্ণ ফ্যাগোসাইটোসিস জুড়ে এমন জৈব রাসায়নিক, জৈব পদার্থবিজ্ঞান-এর কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে যার ফলে এ প্রক্রিয়ার সুচিন্তিত ধাপ শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব বলা চলে। প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনার সুবিধার জন্য ফ্যাগোসাইটোসিসকে নিচে বর্ণিত ৭টি ধাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

১. ম্যাক্রোসাইটের সক্রিয় হওয়া (Activation of Macrocytes) : জীবাণু সংক্রমণের ফলে প্রদাহস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকণিকা, টিস্যু বা রক্তজমাট থেকে উৎপন্ন কাইনিন, হিস্টামিন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস ইত্যাদি রাসায়নিকে উদ্দীপ্ত হয়ে ম্যাক্রোসাইটগুলো (ম্যাক্রোফেজ/নিউট্রোফিল) কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে ক্ষতস্থানে অভিযাত্রী হয়। ম্যাক্রোসাইটগুলো যখন সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়ে ক্ষতস্থানে জড়ো হতে থাকে সে প্রক্রিয়াকে বলে কেমোট্যাক্সিস (chemotaxis)।

২. অণুজীব ভক্ষণ (Ingestion) : সক্রিয় হওয়ার পর ক্রমশঃ অণুজীবের দেহতলের সংস্পর্শে এলে ফ্যাগোসাইটে (ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল) দ্রুত যে ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার ফলে ফ্যাগোসাইট ক্ষণপদ সৃষ্টি করে অণুজীব ভক্ষণে উদ্যত হয় এবং মাত্র ০.০১ সেকেন্ডে একটি ব্যাকটেরিয়াম ভক্ষণ সম্পন্ন করতে পারে।

CamScanner

৩. ফ্যাগোজোম সৃষ্টি (Formation of Phagosome) : অণুজীব ভক্ষণের উদ্দেশে ফ্যাগোসাইট ক্ষণপদ বের করে ব্যাকটেরিয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এবং ক্ষণপদের মাঝে সৃষ্ট গহ্বরে আবদ্ধ করে। দুদিক থেকে আসা ক্ষণপদের অগ্রভাগ আরো এগিয়ে পরস্পর একীভূত হয়। এভাবে সৃষ্ট ঝিল্লিবেষ্টিত থলিকাটি **ফ্যাগোজোম** নামে পরিচিত। ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অ্যাকটিন ও অন্যান্য সঙ্কোচনশীল তন্তু ফ্যাগোজোমের চতুর্দিক ঘিরে রাখে। এসব তন্তুর সঙ্কোচনে ফ্যাগোসাইটের ঝিল্লি থেকে ফ্যাগোজোম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে ঝিল্লিবেষ্টিত থলিকার মতো চালিত হয়।

৪. ফ্যাগোলাইসোজোম সৃষ্টি (Formation of Phagolysosome): আবদ্ধ ব্যাকটেরিয়াসহ ফ্যাগোজোম সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে পরিযায়ী হয়। এ সময় সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত গোল, ঝিল্লিবেষ্টিত ও হাইড্রোলাইটিক এনজাইমপূর্ণ দু'একটি **লাইসোজোম** নামক কোষ-অঙ্গাণু ও অন্যান্য সাইটোপ্লাজমিক দানা ফ্যাগোজোমের ঝিল্লির সঙ্গে একীভূত হয়। একীভূত লাইসোজোম থেকে ব্যাকটেরিয়ানাশক (bactericidal agents) ও পরিপাক এনজাইম (digestive enzyme) ফ্যাগোজোমে ক্ষরিত হয়। ফ্যাগোজোমটি তখন ঝিল্লিবেষ্টিত একটি **পরিপাক থলিকা** (digestive vesicle)-য় পরিণত হয়। থলিকাটিকে **ফ্যাগোলাইসোজোম** বলে।

চিত্র ১০.৬ : ফ্যাগোসাইটোসিসের ধাপসমূহ

৫. ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃকোষীয় মারণ ও পাচন (Intracellular killing and digestion of Bacteria): ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস ও পরিপাকের জন্য লাইসোজোম ফ্যাগোজোমের সঙ্গে একীভূত হয়ে দুধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। গ্রাসের কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাকটেরিয়ার চলন, রেচন, জননসহ যাবতীয় কার্যকলাপ রুদ্ধ হয়ে যায়। ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য বহিরাগত প্রোটিন অণুকে হজম করার জন্য ফ্যাগোসাইটের লাইসোজোম থেকে বিপুল পরিমাণ **প্রোটিওলাইটিক এনজাইম** ক্ষরিত হয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া পরিপাকে এসব এনজাইম যথেষ্ট। অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ এনজাইম কার্যকর হয়, ব্যর্থ হলে যক্ষ্মার মতো অসুখের সৃষ্টি হতে পারে।

৬. অপাচ্য অংশসহ ব্যাকটেরিয়ার অবশেষ (Residual body containing indigestible materials): ফ্যাগোজোম ঝিল্লিবেষ্টিত পরিপাক গহ্বর হওয়ায় ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস বা হজমের কোনো পর্যায়ে ক্ষতিকর কোনো অংশ ফ্যাগোলাইসোজোমের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে পারে না। তবে উপযুক্ত পুষ্টি পদার্থ উৎপন্ন হলে তা ফ্যাগোজোমের সাইটোপ্লাজমে শোষিত হয়।

৭. বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশন (Discharge of waste materials) : বেশি সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করায় এবং তা পরিপাকের পর বর্জিত বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চয় বা লাইসোজোমের ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক পদার্থ সঠিকভাবে ফ্যাগোজোমে পতিত না হয়ে ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হওয়ায় প্রতিটি নিউট্রোফিলই মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে, ম্যাক্রোফেজ উৎপন্ন বিষাক্ত ও অপাচ্য অংশ ত্যাগ করে নতুন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে তৎপর হয়।

সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতা (তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর) (The Innate & Acquired Immunity)

মানবদেহকে রোগাক্রান্ত করতে সর্বশেষ যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জীবাণুকে পরাস্ত করতে হয় সেটি হচ্ছে **তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর**। এ স্তরটি দুধরনের, যেমন– **সহজাত প্রতিরক্ষা** (Innate or Inborn Immunity) এবং **অর্জিত প্রতিরক্ষা** (Acquired Immunity)। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

সহজাত প্রতিরক্ষা (Innate Immunity)

মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা বা অনাক্রম্যতা অমরার মাধ্যমে প্রাপ্ত ও জন্মের সময় থেকে আজীবন উপস্থিত থাকে এবং প্রতিরক্ষায় দ্রুত কার্যকর হয় তাকে সহজাত প্রতিরক্ষা বলে। সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি নির্দিষ্ট। অর্থাৎ মানব প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যে একই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো থাকলেও তার কার্যকারিতার মাত্রা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্নতর হয়।

এটি নিচে বর্ণিত ধরনের হতে পারে, যেমন–

১. প্রজাতিগত প্রতিরক্ষা (Species immunity) : অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরজীবীর আক্রমণ বিশেষ প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, ম্যালেরিয়ার পরজীবী (*Plasmodium vivax*) মানুষ ও মশকীর উপর পরজীবী।

২. গোষ্ঠীগত প্রতিরক্ষা (Racial immunity) : কোন বিশেষ পরজীবী দ্বারা মানুষের কোন কোন গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়। অপর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ পরজীবীটির আক্রমণ সহজেই প্রতিরোধ করে। যেমন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ শ্বেতাঙ্গ মানুষের চেয়ে বেশি যক্ষ্মার শিকার হতে দেখা যায়।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা (Individual immunity) : কোন কোন মানুষ নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য পরজীবীর সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

সহজাত প্রতিরক্ষা নিম্নোক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে–

১. প্রতিবন্ধক (Barriers) : প্রতিবন্ধক টিস্যুগুলো হচ্ছে ত্বক, পৌষ্টিকনালি, শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে জননালির প্রাচীর প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

২. প্রদাহ (Inflammation) : টিস্যুর কোনো ক্ষতি হলে মাস্টকোষের তৎপরতায় নানা ধরনের কণিকা বিশেষ করে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ জড়ো হয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ফলে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার অবসান ঘটে।

৩. কমপ্লিমেন্ট (Complement) : অন্ততঃ ২০ ধরনের প্লাজমা-প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে তাকে কমপ্লিমেন্ট বলে। সক্রিয় হলে অণুজীবের কোষঝিল্লিতে আটকে থেকে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে কোষভক্ষণে সহযোগিতা করে, কিংবা কোষধ্বংসে অংশ গ্রহণ করে।

৪. ইন্টারফেরন (Interferon) : ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আক্রান্ত কোষ থেকে ইন্টারফেরন্ নামক বিশেষ ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয়ে দেহকোষকে রক্ষা করে।

৫. সহজাত মারণকোষ (Natural killer cells) : এগুলো লিম্ফোসাইট জাতীয় বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা যা টিউমার কোষ ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে।

৬. সহজীবী ব্যাকটেরিয়া (Symbiotic bacteria) : পরিপাকতন্ত্র, ত্বক ও নারীদের জননতন্ত্রে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে। এগুলো ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন কোলনে বাসকারী ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন B ও K সংশ্লেষ করে)। কিছু অণুজীব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুর বৃদ্ধি রহিত করে দেয়।

অর্জিত প্রতিরক্ষা (Acquired Immunity)

মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জন্মসময় থেকে নয়, বরং জন্মের পর কোনো নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ার কিংবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় তাকে অর্জিত প্রতিরক্ষা বলে। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি স্পেসিফিক ইমিউনিটি (specific immunity)। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুরকম: (ক) সক্রিয় প্রতিরক্ষা এবং (খ) অক্রিয় প্রতিরক্ষা।

ক. সক্রিয় প্রতিরক্ষা (Active Immunity)

এটি এমন ধরনের অর্জিত প্রতিরক্ষা যাতে দেহের কোষ অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

কীভাবে দেহে কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে সক্রিয় প্রতিরক্ষা দুধরনের হয়, যেমন–

i. **কোষ মাধ্যম প্রতিরক্ষা (Cellular Immunity) :** প্রতিরক্ষাতন্ত্রের বিশেষ কোষ যখন সরাসরি দেহের ভিতরে সক্রিয়ভাবে জীবাণু ও পরজীবী প্রতিরোধ করে তখন তাকে **কোষ মাধ্যম প্রতিরক্ষা** বলে। এক্ষেত্রে T-লিম্ফোসাইট প্রধান ভূমিকা রাখে। T-লিম্ফোসাইট তিনভাবে কাজ করে, যেমন-এরা জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে, সরাসরি আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে এবং সাইটোকাইন নিঃসরণ করে পার্শ্ববর্তী পরিবেশের পরিবর্তন করে।

ii. **রক্ত মাধ্যম প্রতিরক্ষা (Humoral Immunity) :** প্রতিরক্ষাতন্ত্রের বিশেষ কোষ থেকে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়ে রক্তরস, লসিকা বা টিস্যুরস বাহিত হয়ে অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণের মাধ্যমে যখন জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে তখন তাকে **রক্ত মাধ্যম প্রতিরক্ষা** বলে। এক্ষেত্রে B-লিম্ফোসাইট প্রধান ভূমিকা রাখে। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে যা সুনির্দিষ্টভাবে বহিরাগত অণুজীব ও তাদের সৃষ্ট বিষের সাথে যুক্ত হয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে।

কীভাবে দেহে অর্জিত হয় তার উপর ভিত্তি করে সক্রিয় অনাক্রম্যতা দুধরনের হয়, যেমন–

i. **প্রাকৃতিক সক্রিয় প্রতিরক্ষা (Natural Active Immunity) :** এ ধরনের প্রতিরক্ষায় অনিচ্ছাকৃত জীবাণুর সংস্পর্শে আসায় সংক্রমণ ঘটে এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরক্ষা গড়ে উঠে। যেমন-হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সংক্রমণ। এ ধরনের প্রতিরক্ষা দীর্ঘদিন থাকে, কখনওবা আজীবন থাকে।

ii. **কৃত্রিম সক্রিয় প্রতিরক্ষা (Artificial Active Immunity) :** এ ধরনের প্রতিরক্ষায় ভ্যাক্সিনেশনের পর জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরক্ষা গড়ে উঠে। যেমন-**DPT ভ্যাক্সিন ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুস্টংকার) ও পারটাসিস (হুপিংকাশি)**-এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে।

খ. অক্রিয় প্রতিরক্ষা (Passive Immunity)

এটি এমন ধরনের অর্জিত প্রতিরক্ষা যাতে অ্যান্টিবডি এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্যের দেহে বা প্রাণিদেহ থেকে মানবদেহে প্রবেশ করানো হয়। এটি নিচে বর্ণিত দুধরনের।

i. **প্রাকৃতিক অক্রিয় প্রতিরক্ষা (Natural Passive Immunity) :** এ ধরনের প্রতিরক্ষায় **অমরা বা কলোস্ট্রাম (শাল দুধ)**-এর মাধ্যমে অ্যান্টিবডি মায়ের শরীর থেকে শিশুদেহে প্রবেশ করে। এভাবে স্থানান্তরিত অ্যান্টিবডি কয়েক সপ্তাহমাত্র টিকে থাকে। এ সময়ের মধ্যে **শিশুদেহে নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্নের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষাতন্ত্র গড়ে উঠে**।

ii. **কৃত্রিম অক্রিয় প্রতিরক্ষা (Artificial Passive Immunity) :** এ ধরনের প্রতিরক্ষায় ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহে অ্যান্টিবডি প্রবেশ করানো হয়। যেমন-রোগ ভোগের পর সেরে ওঠা ব্যক্তির সিরাম আক্রান্ত অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করানো। কোথাও একটি নতুন বা অত্যন্ত ক্ষতিকর রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে এবং সে মুহূর্তে সঠিক চিকিৎসার অভাবে এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

অর্জিত প্রতিরক্ষার ধাপসমূহ (Steps of Acquired Immunity)

কোষ-নির্ভর প্রতিরক্ষা ও অ্যান্টিবডি-নির্ভর প্রতিরক্ষায় অণুজীব বা বহিরাগত কণা (বিজাতীয় পদার্থ) ধ্বংসে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও সাধারণ ধাপ উভয় ক্ষেত্রেই এক রকম। সাধারণভাবে অর্জিত প্রতিরক্ষার ধাপগুলো নিচে বর্ণিত ৭টি শিরোনামের অধীনে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **ভীতি (Threat) :** যখন **MHC (Major Histocompatibility Complex)** পরিচয়বিহীন একটি অণু বা অণুজীব (অ্যান্টিজেন) ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে দেহে প্রবেশ করে তখন থেকেই অর্জিত প্রতিরক্ষার সূত্রপাত ঘটে।

২. **সন্ধান (Detection) :** ম্যাক্রোফেজ সারাদেহে সংবহিত হয় এবং চলার পথে বহিরাগত পদার্থ বা অণুজীব পেলে গ্রাস করে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে ভক্ষিত পদার্থ পরিপাকের পর অতিক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়।

CamScanner

৩. সতর্ক (Alert) : দেহে একটি অ্যান্টিজেন রয়েছে তা বোঝানোর জন্যে পরিপাককৃত বহিরাগত পদার্থের কিছু কণা ম্যাক্রোফেজের কোষঝিল্লিতে MHC স্বচিহ্নিতকারী অংশে বাহিত হয়। ফলে ইমিউনতন্ত্রের প্রধান কোষ হেলপার T-কোষ সতর্ক হয়ে যায়। এভাবে ম্যাক্রোফেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ **অ্যান্টিজেন-উপস্থাপক কোষ** (antigen-presenting cell, সংক্ষেপে APC) হিসেবে কাজ করে। লসিকা গ্রন্থির B-কোষ ও ডেন্ড্রাইটিক কোষ নামক আরও দুধরনের কোষ APC হিসেবে কাজ করে। ম্যাক্রোফেজ সঠিক ধরনের রিসেপ্টরযুক্ত হেলপার T-কোষের কাছে অ্যান্টিজেনকে উপস্থাপন করে। T-কোষ সমগ্র অর্জিত প্রতিরক্ষা সাড়ার মেইন সুইচের মতো কাজ করে এবং সঠিক হেলপার T-কোষ না পাওয়া পর্যন্ত অ্যান্টিজেন নিয়ে পরিভ্রমণ করে। সঠিক T-কোষ পেলে ম্যাক্রোফেজ তার সাঙ্গে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, ফলে T-কোষ উদ্দীপ্ত হয়।

৪. বিপদ সংকেত (Alarm) : কয়েক ঘন্টার মধ্যে সক্রিয় হেলপার T-কোষ তার নিজস্ব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। সেই ক্ষরণে উদ্দীপ্ত সঠিক B-কোষ ও সাইটোটক্সিক T-কোষ নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে আটকাতে এগিয়ে আসে।

৫. নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নির্মাণ (Building Specific Defense) : উদ্দীপ্ত সঠিক B–কোষ ও T–কোষগুলো সক্রিয় হয়ে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে শুরু করে, ফলে জিনগত সদৃশ কোষগুচ্ছ গড়ে ওঠে। এর নাম **ক্লোন** (clone)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রত্যেক মানবদেহে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি (১০ কোটির বেশি) লিম্ফোসাইট ক্লোন রয়েছে। ক্লোনে দুধরনের কোষ সৃষ্টি হয়। এক ধরনের কোষ নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় হয়ে দেহরক্ষায় কাজ করে। এগুলোকে **কার্যকর কোষ** (effector cells) বলে। আরেক ধরনের কোষ নির্দিষ্ট ঐ অ্যান্টিজেনের স্মৃতি বহন করে ভবিষ্যতে ঐ অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এসব কোষের নাম **স্মৃতি কোষ** (memory cells)। যে প্রক্রিয়ায় এমন বিশেষায়িত ক্লোনের সৃষ্টি হয় তাকে **ক্লোনাল সিলেকসন** (clonal selection) বলে।

৬. প্রতিরক্ষা (Defense) : অর্জিত প্রতিরক্ষায় দুধরনের প্রতিরক্ষা সাড়া (immune response)-র মাধ্যমে মানবদেহে প্রতিরক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও বজায় থাকে।

- **অ্যান্টিবডি-নির্ভর সাড়া** (Antibody-Mediated Response) : এ ধরনের সাড়ায় B-কোষ বিভাজিত হয়ে যে কার্যকর (effector) কোষ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে **প্লাজমাকোষ** (plasma cell) বলে। প্লাজমাকোষ রক্তস্রোতে মুক্ত নির্দিষ্ট গড়নের অ্যান্টিজেনের বিপক্ষে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।
- **কোষ-নির্ভর সাড়া** (Cell-Mediated Response) : সাইটোটক্সিক T–কোষ হচ্ছে কোষ নির্ভর সাড়া দানে কার্যকর T-কোষ। এসব কোষ অ্যান্টিজেনবাহী কোষগুলোকে ধ্বংস করে। যখন ২টি ঘটনা যুগপৎ সংঘটিত হয় তখন সাইটোটক্সিক T-কোষ টার্গেট কোষ ধ্বংসে সক্রিয় হয় : (ক) সাইটোটক্সিক T–কোষ যখন অ্যান্টিজেন উপস্থাপনকারী কোষের (APC, যেমন-ম্যাক্রোফেজের) সম্মুখীন হয়; এবং (খ) যখন একটি হেলপার T-কোষ সাইটোটক্সিক T-কোষকে সক্রিয় করতে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। সাইটোটক্সিক T–কোষ সক্রিয় হলে বিভাজিত হয় এবং স্মৃতিকোষ ও কার্যকর সাইটোটক্সিক T– কোষ উৎপন্ন হয়।

৭. অতন্দ্র প্রহরা (Continuous surveillance) : একটি অ্যান্টিজেন যখন প্রথমে দেহে প্রবেশ করে তখন কয়েকটিমাত্র লিম্ফোসাইট সেটাকে শনাক্ত করতে পারে। সেই লিম্ফোসাইটগুলো খুঁজে বের করে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে অগণিত লিম্ফোসাইট উৎপন্ন করতে হয়। এ কারণে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে **মুখ্য সাড়া** (primary response) ধীরে সংঘটিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশের ১ বা ২ সপ্তাহ পর চরম মাত্রায় পৌঁছায়। দেহে যদি আবারও (অনেক বছর পর বা কয়েক যুগ পর হলেও) একই অ্যান্টিজেনের অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে সাড়াদান ঘটে দ্রুত ও শক্তিশালী। এটি **গৌণ সাড়া** (secondary response) নামে পরিচিত। মুখ্য সাড়ায় B–কোষ ও T–কোষগুলো উদ্দীপ্ত ও বিভাজিত হয়ে কেবল অ্যান্টিজেন বিরোধী **কার্যকরকোষ** (effector cells) সৃষ্টি করে না, বরং **স্মৃতিকোষ** (memory cells)ও উৎপন্ন করে। স্মৃতি কোষ অনেক বছর, এমন কি কয়েক যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। ফলে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দেয়ার মতো দক্ষ লিম্ফোসাইটের সংখ্যা থাকে বেশি, সাড়া হয় প্রচন্ড ও দ্রুত। দু'তিন দিনের মধ্যে কার্যকর (effectors) কোষের সংখ্যা চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়।

CamScanner

সহজাত প্রতিরক্ষা ও অর্জিত প্রতিরক্ষার মধ্যে পার্থক্য		
তুলনীয় বিষয়	সহজাত প্রতিরক্ষা	অর্জিত প্রতিরক্ষা
১. স্থায়িত্ব	আজীবন।	স্বল্প বা দীর্ঘস্থায়ী।
২. উপস্থিতি	সবসময় উপস্থিত।	উপস্থিতি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।
৩. পূর্ব অভিজ্ঞতা	পূর্বে আক্রান্তের প্রয়োজন হয় না।	পূর্বে আক্রান্তের প্রয়োজন হয়।
৪. সাড়াদান কাল	তাৎক্ষণিক	প্রথমবার ৫-৬ দিন থেকে ১-২ সপ্তাহ। পরে দ্রুত সাড়া।
৫. স্মৃতিকোষ	সৃষ্টি হয় না।	B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট থেকে সৃষ্টি হয়।
৬. অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া	সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্টি হয়।
৭. প্রতিবন্ধক	তাপমাত্রা, pH, ত্বক ও মিউকাস ঝিল্লি হচ্ছে প্রতিবন্ধক।	লসিকা পর্ব, প্লীহা ও লিম্ফয়েড টিস্যু হচ্ছে প্রতিবন্ধক।
৮. উপাদান	ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক, মারণ কোষ, প্লাজমাপ্রোটিন, ফ্যাগোসাইট, ব্লেব্রাইট কোষ।	B-কোষ ও T-কোষ।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা (Role of Antibody in Immune System)

দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র (immune system) থেকে উৎপন্ন এক ধরনের দ্রবণীয় গ্লাইকোপ্রোটিন যা রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে (যেমন-ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে তাকে অ্যান্টিবডি বলে। প্রত্যেকটি অ্যান্টিবডি হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (সংক্ষেপে Ig) নামে বিশেষ ধরনের একেকটি প্রোটিন অণু।

শ্বেত রক্তকণিকার অন্যতম প্রধান কণিকা লিম্ফোসাইট। লিম্ফোসাইট দুধরনের : (১) T-কোষ ও (২) B-কোষ। B-লিম্ফোসাইট কয়েক উপধরনে বিভক্ত যার একটি হচ্ছে প্লাজমা B-কোষ, সংক্ষেপে প্লাজমাকোষ নামে পরিচিত। প্লাজমাকোষ থেকে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনে প্রত্যেক প্লাজমাকোষ প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করতে পারে। মানুষের দেহে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে।

অ্যান্টিবডির গঠন (Structure of Antibody)

প্রত্যেক অ্যান্টিবডির মৌলিক গঠন এক। গাঠনিক অংশগুলো নিম্নরূপ:

১. **ভারী ও হালকা শৃঙ্খল (Heavy and Light chains) :** প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে দুজোড়া পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে। এর মধ্যে সদৃশ একজোড়া লম্বা ও ভারী শৃঙ্খল এবং অন্য জোড়া সদৃশ হালকা শৃঙ্খল। ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের আণবিক ওজন হচ্ছে যথাক্রমে ৫০–৭০ kD ও ২৩ kD (kiloDaltons)।

২. **ডাইসালফাইড বন্ড (Disulfide Bonds) :** প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ড রয়েছে। একটি বন্ড থাকে দুই-ভারী শৃঙ্খলের মাঝে, বাকি দুটি থাকে দুপাশে ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের মাঝে। অ্যান্টিবডির গড়ন দেখতে Y-আকৃতির মতো। আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ডের সংখ্যা বিভিন্ন অ্যান্টিবডিতে বিভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেকটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল আবার অন্তঃস্থভাবে অন্তশৃঙ্খল (intra-chain) ডাইসালফাইড বন্ডে যুক্ত থাকে।

৩. **স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অঞ্চল (Constant and Variable regions) :** প্রত্যেক অ্যান্টিবডি দুই অঞ্চলবিশিষ্ট গঠনে নির্মিত: একটি **স্থায়ী অঞ্চল**, অন্যটি **পরিবর্তনশীল অঞ্চল**। ধরন অনুযায়ী প্রত্যেক অ্যান্টিবডির ভারী ও হালকা শৃঙ্খলে অ্যামিনো এসিড ক্রম (sequence) অনুযায়ী ওই দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ধরনের ইমিউনোগ্লোবিনের (যেমন-IgG-তে কিংবা IgA-তে) স্থায়ী অঞ্চলে অ্যামিনো এসিড ক্রম একই থাকে। কিন্তু পরিবর্তনশীল অংশকে অ্যান্টিজেন (জীবাণু) ধরার জন্য আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে খাপ খাওয়াতে হয় বলে ক্রমের পরিবর্তন হতে পারে। পরিবর্তনশীল অঞ্চল নির্মাণে ভারী ও হালকা উভয় শৃঙ্খলই অংশ গ্রহণ করে। অ্যান্টিজেন ধরার

এ অংশটির নাম প্যারাটপ (paratope)। এটি তালা-চাবি (lock and key) পদ্ধতিতে কাজ করে। এক্ষেত্রে 'চাবি' হচ্ছে প্যারাটপ, আর 'তালা' অ্যান্টিজেন (জীবাণু)।

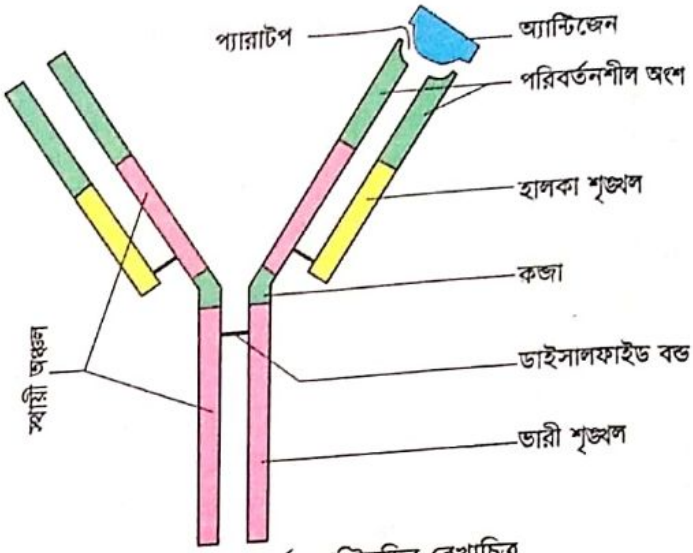

চিত্র ১০.৭ : একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির রেখাচিত্র

ভারী শৃঙ্খলের স্থায়ী অঞ্চলে অ্যামিনো এসিডের ক্রম-এর ভিত্তিতে অ্যান্টিবডি মাত্র ৫ ধরনের হলেও পরিবর্তনশীল অঞ্চলের (ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের) প্যারাটপে যখন জরুরী অবস্থায় বিশেষ বিশেষ জিনখন্ডের (subgene) এলোপাথাড়ি (random) সম্মিলনের ফলে পরিবর্তন ঘটে তখন কোটি কোটি ভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়। [এ প্রক্রিয়ার নাম **VDJ রিকম্বিনেশন**। V= Variable, D= diversity, J = Joining subgene] বিজ্ঞানীদের ধারণা মানুষের দেহে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে। আমাদের জীবদ্দশায় ১০ কোটি অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করবে বা করতে পারে তা অকল্পনীয়।

৪. **কব্জা অঞ্চল (Hinge Region)** : অ্যান্টিবডি অণুর বাহুদুটি যে সংযোগস্থল থেকে দুভাগ হয়ে যায় তা **কব্জা অঞ্চল**। অংশটি অ্যান্টিবডিকে কিছুটা নমনীয়তা দান করে। বাহুদুটির দুপ্রান্তে অবস্থিত একটি করে মোট দুটি প্যারাটপে দুটি অ্যান্টিজেনকে আটক করা যায়।

অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ (Types of Antibody)

অ্যান্টিবডির গড়নে যে ভারী শৃঙ্খল রয়েছে তাতে অ্যামিনো এসিডের ক্রমের (sequence) ভিত্তিতে ভারী শৃঙ্খল ৫ ধরনের: γ-(gamma), α (alpha), μ (mu), Є (epsilon) এবং δ (delta)। এ পাঁচ ধরনের ভারী শৃঙ্খলবিশিষ্ট অ্যান্টিবডিগুলো নিচে বর্ণিত ৫টি শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন G(IgG)** : দেহের মোট ইমিউনোগ্লোবিউলিনের (Ig) 75% IgG। রক্ত, লসিকা, অন্ত্র ও টিস্যু তরলে এ Ig বিস্তৃত থাকে। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমিক সক্রিয় করে এবং অনেক বিষাক্ত পদার্থকে প্রশমিত করে। IgG ই একমাত্র অ্যান্টিবডি যা গর্ভাবস্থায় অমরা অতিক্রম করে মায়ের অর্জিত প্রতিরক্ষাকে ভ্রূণদেহে বাহিত করে।

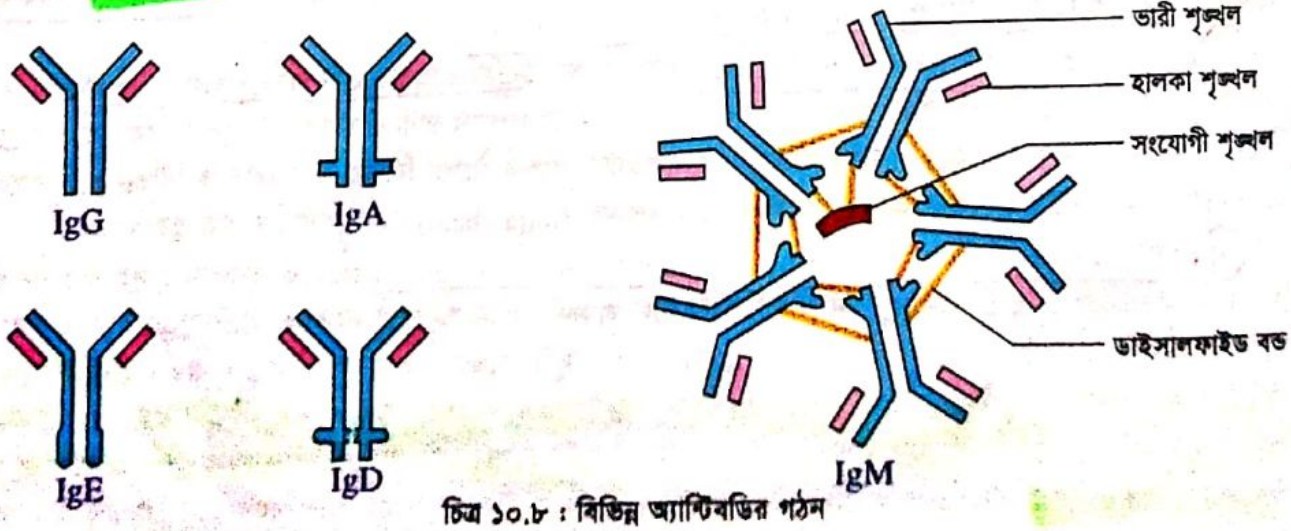

চিত্র ১০.৮ : বিভিন্ন অ্যান্টিবডির গঠন

২. ইমিউনোগ্লোবিউলিন A (IgA) : দেহের মোট Ig-র মধ্যে ১৫% হচ্ছে IgA। এ ধরনের অ্যান্টিবডি মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত থাকে, যেমন–পরিপাক, জনন ও শ্বসনতন্ত্রে বিস্তৃত হয় এবং সেখানে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ও অণুকণাকে প্রশমিত করে। মায়ের দুধেও IgA পাওয়া যায় এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুদেহে স্থানান্তরিত হয়।

৩. ইমিউনোগ্লোবিউলিন M (IgM) : দেহের মোট Ig-এর ৫-১০% IgM। ABO ব্লাড গ্রুপের রক্তকণিকার অ্যান্টিবডি এ ধরনের। IgM পাওয়া যায় রক্ত ও লসিকায়। এটি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করে এবং বহিরাগত কোষকে পরস্পরের সঙ্গে আসঞ্জিত করে দেয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ইমিউন সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে IgG ও IgM একত্রে কাজ করে।

৪. ইমিউনোগ্লোবিউলিন D (IgD) : দেহের মোট Ig-র মধ্যে ১%-এরও কম হচ্ছে IgD। রক্ত, লসিকা ও লিম্ফোসাইট B-কোষে এ Ig পাওয়া যায়। এর কাজ অজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞানিদের ধারণা, IgD B– কোষকে সক্রিয়করণে ভূমিকা পালন করে।

৫. ইমিউনোগ্লোবিউলিন E (IgE) : দেহের মোট Ig-র মধ্যে প্রায় ০.১% হচ্ছে IgE। এটি দুর্লভ Ig। B–কোষ, মাস্টকোষ ও বেসোফিলে এ Ig পাওয়া যায়। হিস্টামিন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে এটি প্রদাহ সাড়া (inflammatory response) সক্রিয় করে। বিভিন্ন অ্যালার্জিক সাড়া দানে (যেমন-সন্ধিবাতে) এ অ্যান্টিবডির ভূমিকা বেশ নেতিবাচক প্রমাণিত হয়েছে।

অ্যান্টিবডির কার্যপদ্ধতি

মানবদেহকে সুস্থ-সবল-সচল রাখতে বিভিন্ন শ্রেণির অ্যান্টিবডি অব্যাহতভাবে যে অনন্য গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে সে সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনো অ্যান্টিজেন দেহের ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে অবশেষে ৩য় স্তরে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডির সুসমঞ্জস্য কাজের ধারায় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অ্যান্টিবডির কাজের পদ্ধতিকে ৩টি প্রধান শিরোনামভুক্ত করা যায়: ১. অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ, ২. কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ এবং ৩. সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ : রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত অণুজীব বা অণুকণাকে সরাসরি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করা অন্যতম প্রধান কার্যপদ্ধতি। নিচে বর্ণিত বিভিন্নভাবে অ্যান্টিবডি প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করে।

□ **স্তূপীকরণ বা অ্যাগ্লুটিনেশন** (Agglutination) : যে প্রক্রিয়ায় রক্ত বা লসিকায় সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত অণুজীব বা অণুকণা দলা পাকিয়ে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাকে **স্তূপীকরণ** বলে। প্রত্যেক অ্যান্টিবডি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। দেহে অণুজীব বা অণুকণার অনুপ্রবেশ ঘটলে সেই বহিরাগত পদার্থের গায়ে উপস্থিত অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দিয়ে অ্যান্টিবডি ক্রিয়াশীল হয়। প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে দুটি করে অ্যান্টিজেন-বাঁধনস্থল থাকে, অতএব একটি অ্যান্টিবডি দুটি অ্যান্টিজেনকে আটকাতে পারে। এভাবে অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেনের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দলা পাকিয়ে নিশ্চল বড় স্তূপের মতো পড়ে থাকে। ফলে খুব সহজেই ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল নামক শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তা গ্রাস করে।

□ **অধঃক্ষেপন** (Precipitation) : যে প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় অ্যান্টিজেনের (যেমন–টিটেনাস টক্সিন) আণবিক যৌগ **প্রিসিপিটিন** (precipitin) অ্যান্টিবডির সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে বড়, জালিকাকার ও অদ্রবণীয় বস্তু হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয় তাকে **অধঃক্ষেপণ** বলে। অধঃক্ষিপ্ত অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি দলাকে খুব সহজে ফ্যাগোসাইটিক কোষ গ্রাস করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে।

CamScanner

❒ **প্রশমন** (Neutralization) : যে প্রক্রিয়ায় একটি অ্যান্টিবডি কোনো অ্যান্টিজেনের ক্ষতিকারক অংশগুলোকে ঢেকে রেখে ক্ষতিকর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে বাধা দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয় কিংবা অ্যান্টিজেন–ক্ষরিত টক্সিনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে তার বিষক্রিয়া থেকে অন্যান্য দেহকোষকে রক্ষা করে তাকে প্রশমন বলে।

❒ **বিশ্লিষ্টকরণ** (Lysis) : কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবডি যে প্রক্রিয়ায় সরাসরি বহিরাগত অণুজীবের ঝিল্লি আক্রমণ ও বিদীর্ণ করার মধ্য দিয়ে অণুজীবের দেহকে ফাটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তাকে বিশ্লিষ্টকরণ বলে।

২. কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ : অন্তত ২০ ধরনের প্লাজমা-প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে তাকে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বা কমপ্লিমেন্ট বলে। অ্যান্টিবডির কাজের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিভিন্ন উপায়ে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে।

❒ **অপসোনাইজেশন** (Opsonization) : দেহে অনুপ্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার গায়ে অ্যান্টিজেন–অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স যুক্ত হলে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রোটিন নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে প্রচন্ডভাবে ফ্যাগোসাইটোসিসে উদ্বুদ্ধ করে তুলে। এ প্রক্রিয়াকে অপসোনাইজেশন বলে। এভাবে কম সময়ে শতগুণ বেশি সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া গ্রাসে ফ্যাগোসাইটগুলো ভূমিকা পালন করে।

❒ **বিশ্লিষ্টকরণ** (Lysis) : কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক ধরনের কমপ্লিমেন্টে গঠিত **লাইটিক কমপ্লেক্স** (lytic complex) নামে একটি বিশেষ গ্রুপ। এ গ্রুপভুক্ত কমপ্লিমেন্ট বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবের কোষঝিল্লি বিদারণের মাধ্যমে অণুজীব ধ্বংসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

❒ **স্তূপীকরণ** (Agglutination) : কমপ্লিমেন্ট থেকে উৎপন্ন পদার্থের বিক্রিয়ায় বহিরাগত অণুজীবের ঝিল্লি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যার ফলে অণুজীবগুলো পরস্পর সংলগ্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল স্তূপের মতো পড়ে থাকে।

❒ **ভাইরাসের প্রশমন** (Neutralization of Viruses) : কমপ্লিমেন্ট থেকে ক্ষরিত এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থ ভাইরাসের গঠনকে আক্রমণ করে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

❒ **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis): অণুজীবের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকণিকা, টিস্যু, রক্তজমাট ও ব্যাকটেরিয়ার নানা রাসায়নিক ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটগুলো সেখানে (ক্ষতস্থানে) ধাবিত হয়। এভাবে রাসায়নিক সংবেদের প্রতি সাড়া দেয়াকে **কেমোট্যাক্সিস** বলে। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের কিছু প্রোটিন ফ্যাগোসাইটকে কেমোট্যাক্সিসের প্রতি সাড়া দিতে আকৃষ্ট করায়। গন্তব্যে পৌঁছে ফ্যাগোসাইট কমপ্লিমেন্টের সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকারী ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে পারে।

❒ **মাস্টকোষ ও বেসোফিলের সক্রিয়করণ** (Activation of Mast-cells and Basophils): কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের কিছু প্রোটিন মাস্টকোষ ও বেসোফিলকে আশপাশের তরলে হিস্টামিন, হেপারিন ও অন্যান্য পদার্থ ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। ফলে স্থানীয় রক্তপ্রবাহ, টিস্যুতে তরল পদার্থ ও প্লাজমা-প্রোটিনের প্রবেশ এবং স্থানীয় টিস্যুর বিক্রিয়া বেড়ে যায়। এসব কারণে সৃষ্ট প্রদাহ সাড়ায় জীবাণু নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

৩. সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ : কিছু অ্যান্টিবডি, বিশেষ করে IgE প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি ত্বরান্বিত করে। যে কোনো ক্ষতস্থানে প্রদাহের যে ৪টি মৌলিক ও ধারাবাহিক বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে:

(i) ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায় ; (ii) জায়গাটি গরম হয়; (iii) ফুলে যায় এবং (iv) সবশেষে ব্যথার প্রকাশ ঘটায়। প্রদাহের কারণে ক্ষতস্থানে এমনভাবে পরিবর্তন ঘটে যার ফলে বহিরাগত জীবাণু আর ছড়াতে পারে না। এভাবে মাস্টকোষ ও বেসোফিলের ক্ষরণে প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে সংক্রমণের বিস্তার রুদ্ধ করে দেয়।

CamScanner

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে পার্থক্য	
অ্যান্টিজেন	**অ্যান্টিবডি**
১. অ্যান্টিজেন হলো দেহে অনুপ্রবিষ্টকারী বহিরাগত বস্তু বা প্যাথোজেন।	১. অ্যান্টিবডি হলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে উৎপন্ন অ্যান্টিজেন প্রতিরোধী বস্তু।
২. রাসায়নিক প্রকৃতিতে এরা প্রোটিন বা জটিল কার্বোহাইড্রেট জাতীয়।	২. রাসায়নিক প্রকৃতিতে এরা সবসময় প্রোটিনজাতীয়।
৩. এরা সাধারণত লোহিত কণিকার প্লাজমামেমব্রেনের উপরিতলে বা জীবাণুর উপরিতলে বা দেহতরলে অবস্থান করে।	৩. এরা সাধারণত রক্তরস বা প্লাজমায় থাকে। এছাড়া দেহতরলে, নির্দিষ্ট প্লাজমামেমব্রেনে থাকে।
৪. অ্যান্টিজেনের প্রভাবে অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়।	৪. অ্যান্টিবডির প্রভাবে অ্যান্টিজেন সৃষ্টি হয় না।
৫. এরা অনাক্রম্যতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে।	৫. এরা দেহ প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
৬. এরা ধ্বংসাত্মক।	৬. এরা রক্ষাকারী।

অ্যান্টিবডি ও ইন্টারফেরনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অ্যান্টিবডি	ইন্টারফেরন
১. কাজের প্রকৃতি	মন্থর।	দ্রুত।
২. কার বিরুদ্ধে	ব্যাকটেরীয়, ছত্রাক ও ভাইরাল সংক্রমণ।	ভাইরাল সংক্রমণ।
৩. কার্যকাল	দীর্ঘস্থায়ী।	স্বল্পস্থায়ী।
৪. ক্রিয়াস্থল	কোষের বাইরে।	কোষের ভিতরে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা (Role of Vaccine in Immune System)

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা জীবাণুর নির্যাস বা জীবাণু সৃষ্ট পদার্থ (টক্সিন) কিংবা সংশ্লেষিত বিকল্প পদার্থ থেকে উৎপন্ন যে বস্তু অ্যান্টিজেনের মতো আচরণ করে দেহে অ্যান্টিবডি উৎপন্নে উদ্দীপনা জোগায় এবং এক বা একাধিক রোগের বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে তাকে **ভ্যাক্সিন** (vaccine) বলে। শরীরে মারাত্মক রোগের ভ্যাক্সিন দেয়া থাকলে ভবিষ্যতে ঐসব রোগ দেহকে অসুস্থ করতে পারে না। ভ্যাক্সিন প্রয়োগ **টিকা দেয়া** নামে পরিচিত।

ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner) ১৭৯৬ সালে গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে ইমিউনোলজির সূচনা করেন। এর অনেক বছর পর ফরাসী বিজ্ঞানী **লুই পাস্তুর** (Louis Pasteur) ১৮৮১ সালে অ্যানথ্রাক্স ভ্যাকসিন এবং ১৮৮৫ সালে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন। বর্তমানে যক্ষা, টাইফয়েড, হুপিং কাঁশি, পোলিও, হাম, হেপাটাইটিস-বি, কোভিড-১৯ ইত্যাদি রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু মরণব্যাধি AIDS ও হেপাটাইসিস-সি, ভ্যাকসিন আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

একটি আদর্শ ভ্যাকসিনের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of an Ideal Vaccine)

১. এটি সুস্থিত, সস্তা, সহজলভ্য, নিরাপদ এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন।

২. এটি স্বল্প মাত্রায় কার্যকর।

৩. এটি জীবাণুর জন্য ক্ষতিকর, তবে পোষক বা গ্রহীতার জন্য অক্ষতিকর।

৪. এর কার্যকারিতা দীর্ঘদিন বা সারাজীবন বজায় থাকে।

৫. এটি গ্রহীতার দেহে সারাজীবন বা দীর্ঘকারীন অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

৬. এটি খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা করে।

৭. এটি সুনির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে প্রতিরোধী করে তুলে।

৮. মায়ের অনাক্রম্যতাকে সন্তানে সঞ্চারিত করে।

Edward Jenner

Louis Pasteur

ভ্যাক্সিনের প্রভারভেদ

উৎপাদনের ধরনের উপর ভিত্তি করে ভ্যাক্সিন নিচে বর্ণিত ৫ প্রকার :

১. মৃত বা নিষ্ক্রিয় (Killed or Inactivated) : রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে রাসায়নিক, তাপ, বিকিরণ বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে নিষ্ক্রিয় জীবাণু থেকে উৎপন্ন। যেমন–ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, পোলিও, হেপাটাইটিস A, র‍্যাবিস প্রভৃতি ভ্যাক্সিন।

২. শক্তি হ্রাস (Attenuated) : কালচার করা, ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করে দেয়া জীবিত জীবাণু দিয়ে উৎপন্ন। যেমন–মিজলজ (হাম), মাম্পস, পানিবসন্ত (চিকেন পক্স), টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ভ্যাক্সিন।

৩. টক্সোয়ড (Toxoid) : জীবাণুর নিষ্ক্রিয় বিষাক্ত পদার্থ থেকে উৎপন্ন। যেমন-টিটেনাস (ধনুষ্টংকার), ডিপথেরিয়া প্রভৃতির ভ্যাক্সিন।

৪. উপএকক বা সাবইউনিট (Subunit) : জীবাণুগাত্রের সামান্য অংশ (নির্দিষ্ট প্রোটিনের অংশ) থেকে উৎপন্ন। যেমন–হেপাটাইটিস-B ভ্যাক্সিন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাক্সিন প্রভৃতি।

৫. অনুবন্ধী বা কনজুগেট (Conjugate) : দুটি ভিন্ন উপাদানে গঠিত ভ্যাক্সিন [ব্যাকটেরিয়ার দেহ আবরণের অংশ+ বাহক প্রোটিন]। যেমন-হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-b (Haemophilus influenzae type-b, Hib) ভ্যাক্সিন।

৬. ডিএনএ ভ্যাকসিন (DNA Vaccine) : রিকম্বিনেন্ট DNA পদ্ধতিতে DNA ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে জীবাণু থেকে অ্যান্টিজেনের সংকেতধারী জিনকে আলাদা করে প্লাজমিড ভেক্টরের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। এসব প্লাজমিড মানুষের দেহে অ্যান্টিজেন তৈরি করতে পারে। DNA ভ্যাকসিন পেশিতে ইনজেকশন করলে তা কোষীয় বা হিউমোরাল অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

টিকা তৈরির কৌশল

আক্রমণকারী বা রোগ প্রতিরোধকারী অণুজীবকে কোনো নির্ধারিত জীবকোষে আবাদ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কালচারকৃত এসব অণুজীবকে রসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর অণুজীবগুলোকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় বা নিষ্প্রাণ করে টিকা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন প্রকার টিকা বিভিন্ন উৎস থেকে তৈরি করা হয়। অনেকসময় জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় জিন ক্লোনিং করে অথবা জিন সংশ্লেষ করে টিকা তৈরি করা হয়। টাইফয়েড জ্বরের টিকা *Salmonella typhi* নামক ব্যাকটেরিয়ার মৃতকোষ দিয়ে তৈরি করা হয়। র‍্যাবিস রোগের টিকা *Rabies* ভাইরাসের অর্ধমৃত দেহ হতে তৈরি করা হয়।

ভ্যাক্সিনেশন (Vaccination)

ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে অণুজীবের, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস-এর সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়কে **ভ্যাক্সিনেশন** বলে। প্রক্রিয়াটি সাধারণভাবে **টিকা দেয়া** (inoculation) নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট রোগের ভ্যাক্সিন নির্দিষ্ট জীবাণু থেকেই সংগ্রহ ও উৎপন্ন করা হলেও প্রক্রিয়াগত কারণে এ পদার্থ মানবদেহে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা রোগ সৃষ্টির পরিবর্তে দেহকে রোগমুক্ত রাখতে, রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। রোগের চিকিৎসায় ভ্যাক্সিনের ব্যবহার পদ্ধতিকে **ভ্যাক্সিনোথেরাপি** (vaccinotherapy) বলে।

ড. এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Jenner) ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম **গুটিবসন্তের** (small pox) ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী 'ভ্যাক্সিন বিপ্লব' ঘটিয়ে মানুষের রোগমুক্ত দীর্ঘ সুন্দর জীবনের যে প্রত্যাশা জাগিয়েছেন তার ধারাবাহিকতায় আজ **দ্বিতীয় জেনারেশন** (Second Generation) ভ্যাক্সিন হিসেবে হেপাটাইটিস-B ভ্যাক্সিন উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু AIDS ভ্যাক্সিন আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

ভ্যাক্সিনেশনের ফলে মানবদেহ এমন সব রোগ থেকে রক্ষা পায় যা থেকে শুধু অসুখ-বিসুখই নয়, দেহ পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের ইমিউনতন্ত্রকে বাড়তি শক্তি যোগাতে ভ্যাক্সিন নিম্নোক্তভাবে সক্রিয় থাকে।

১. অধিকাংশ ভ্যাক্সিনে রোগসৃষ্টিকারী মৃত বা দুর্বল জীবাণুর সামান্য অংশ থাকে। দেহে রোগসৃষ্টি করতে পারে এমন সক্রিয় জীবাণু থাকে না। কোন কোন ভ্যাক্সিনে জীবাণু একেবারেই থাকে না।

২. জীবাণুর অংশবিশেষসহ ভ্যাক্সিন যে দেহে প্রবেশ করে অ্যান্টিবডি সৃষ্টির মাধ্যমে ওই নির্দিষ্ট জীবাণুর প্রতি দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে। এসব অ্যান্টিবডি নির্দিষ্ট রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করে।

CamScanner

৩. মানবদেহে দুভাবে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে: (ক) অসুস্থ হলে এবং (খ) ভ্যাক্সিন নিলে। জীবাণুর আক্রমণে অসুস্থ হয়ে রোগে ভুগে কষ্ট শেষে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের চেয়ে আগেভাগেই সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাক্সিন গ্রহণ করা বেশি নিরাপদ। কারণ জীবাণুর আক্রমণে দেহ অসুস্থ হলে সম্পূর্ণ নিরোগ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ দেহ বিকলাঙ্গ হতে পারে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কুৎসিত দাগ হতে পারে, কিংবা জীবনহানিও ঘটতে পারে। অতএব, ভ্যাক্সিনের মতো অস্ত্র থাকতে আমরা কেন দুর্ভোগ পোহাব?

৪. ভ্যাক্সিন গ্রহণের ফলে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি দেহে দীর্ঘদিন বা আজীবন উপস্থিত থাকে। অ্যান্টিবডিগুলো জানে কিভাবে জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হতে হয়। অতএব, ভ্যাক্সিন নেয়ার পর ভবিষ্যতে যদি আসল জীবাণু দেহে প্রবেশ করে তাহলে অ্যান্টিবডির কৌশলে দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র জীবাণু ধ্বংসে সক্রিয় হবে।

৫. অনেক ভ্যাক্সিন আছে যা একবার নিলে আজীবন দেহে কর্মক্ষম থাকে। মাঝে-মধ্যে অতিরিক্ত ডোজ (booster shot) নিতে হয়।

৬. কিছু ভ্যাক্সিন রয়েছে যা মিশ্র ভ্যাক্সিন নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে কয়েকটি রোগের ভ্যাক্সিন যুক্ত করে দেহে প্রবেশ করানো হয়, যেমন–MMR (Measles, Mumps and Rubella) ভ্যাক্সিন।

৭. প্রতিটি মানবদেহ (শিশু বা বয়স্ক) নির্দিষ্ট রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ণ থাকে। কিন্তু সবার প্রতিরক্ষাতন্ত্র এক ও সবল নয় বলে ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সবল করা হয়। শিশু বয়সে কয়েকটি রোগের ভ্যাক্সিন নেয়া থাকলে পরিবারও থাকে নিশ্চিন্ত।

ভ্যাক্সিনের গুরুত্ব / প্রয়োজনীয়তা (Importance of Vaccines)

শৈশব ও কৈশোরকালীন সময়ে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। পোলিও, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়াসহ অন্যান্য মারাত্মক জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ও আজীবন কষ্টকর রোগ-ব্যাধির কবল থেকে নিজের বংশধরকে বাঁচাতে সবাই তৎপর থাকেন। সুস্থ পরিবার ও জাতি গড়তে সুস্থ-সবল বংশধর প্রয়োজন। এ কারণে শৈশবেই ভ্যাক্সিন দেয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সবদেশের সরকার বিবেচনা করে থাকে।

ভ্যাক্সিন সুষ্ঠুভাবে কাজ করে, এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সামান্য। পৃথিবীতে প্রতিবছর ৩ মিলিয়ন লোকের জীবন রক্ষা হয় এবং রোগের কষ্ট থেকে ও স্থায়ী বিকলাঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা পায় আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষ।

নিচে ভ্যাক্সিনের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো –

১. বিভিন্ন ভ্যাক্সিন প্রয়োগে দেহে সক্রিয় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংক্রামক রোগকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়।

২. শিশুদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করে শিশু মৃত্যুর হার কমানো যায়।

৩. পোলিও, গুটিবসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের জীবাণুকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে ভ্যাক্সিনেশন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিত্র ১০.৯ : বাংলাদেশে ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচীর লোগো

৪. কিছু ভ্যাক্সিন যেমন– DPT (Diptheria Pertusis Tetanus), OPV (Oral Polio Vaccine), MMR (Measles Mumps Rubella), BCG (Bacillus Culmitte Guerin) প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব থেকে এ রোগগুলো নির্মূলের প্রচেষ্টা চলছে।

৫. বর্তমানে সবচেয়ে মারাত্মক মরণব্যাধি AIDS- কে প্রতিরোধ করার জন্য ভ্যাক্সিনেশন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে।

অতএব, দুশ্চিন্তাহীন জীবন যাপনের জন্য শুধু নিজের সন্তানকেই নয়, সমাজের প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছে ভ্যাক্সিনেশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা প্রয়োজন।

CamScanner

বাংলাদেশে ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম (Vaccination Programme in Bangladesh)

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা World Health Organization (WHO) সারাবিশ্বকে বিশেষ কিছু রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭৪ সালের মে মাসে সরকারিভাবে বিশ্বব্যাপী টিকাদান বা অনাক্রম্যকরণ (Global Immunization) প্রকল্প শুরু করে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব এক বছরের শিশুদের মধ্যে টিকাদানের মাধ্যমে ৬টি প্রধান রোগকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করা। এ ৬টি রোগ হলো- যক্ষ্মা (Tuberculosis), ডিপথেরিয়া (Diptheria), হুপিংকাশ (Purtusis), ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus), পোলিও (Polio) এবং হাম (Measles)।

এ রোগগুলো প্রতিহত করার জন্য শিশুকে বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন টিকাদান করা হয়। এ টিকাগুলো হলো- BCG (বিসিজি), DTT (ডিপথেরিয়া টিটেনাস টক্সয়েড), PT (হুপিংকাশ বা পারটুসিস টক্সয়েড), TT (ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস টক্সয়েড), OVP (ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন) এবং MV (হাম বা মিসেলস ভ্যাকসিন)।

জাতীয় ভ্যাক্সিনেশনের কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী টিকা দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে–

শিশুর বয়সকাল	সুপরিশকৃত টিকা
জন্মের পর এক মাসের মধ্যে	BCG এবং OPV- O ডোজ
৬ সপ্তাহ বয়সে (দেড় মাস বয়সে)	DPT- ডোজ I, OPV- ডোজ-I এবং হেপাটাইটিস-বি ডোজ- I
১০ সপ্তাহ বয়সে (আড়াই মাস বয়সে)	DPT- ডোজ II, OPV- ডোজ- II এবং হেপাটাইটিস-বি ডোজ- II
১৪ সপ্তাহ বয়সে (সাড়ে তিন মাস বয়স)	DPT- ডোজ III, OPV- ডোজ- III এবং হেপাটাইটিস-বি ডোজ-III
৯ মাস বয়সে	Measles Vaccine
১৬ – ২৪ মাস বয়সে	DPT ও OPV (Booster Dose)
৫ – ৬ বছর বয়সে	DT Vaccine
১০ – ১৬ বছর বয়সে	TT Vaccince

* **বুষ্টার ডোজ** (Booster Dose) : দেহে অধিকমাত্রায় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি ও অনাক্রম্যতা সাধনের জন্য প্রাথমিক ভ্যাকসিন দেয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অন্তর যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় তাকে **বুষ্টার ডোজ** বলে।

১. **পোলিও টিকা (Polio Vaccine)** : পোলিও রোগ ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ, *Enterovirus*-নামক একটি RNA-ভাইরাস থেকে এ রোগ সৃষ্টি হয়। পোলিও রোগের কারণে শিশুরা পঙ্গু হয়ে যায়। এ ভাইরাস পানি, দুধ বা বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে। ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানী সল্ক (Salk) পোলিও প্রতিরোধের টিকা বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন। পোলিও রোগ প্রতিরোধে পাঁচ বছরের নিচে সকল শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়। ১৯৪৪ সাল থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এক কর্মসূচিতে সারা পৃথিবীতে পোলিও রোগ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ অনেকটা পোলিও মুক্ত।

২. **বিসিজি টিকা (BCG Vaccine)** : মানুষের যক্ষ্মা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া হলো *Mycobacterium tuberculosis*। মানুষের ফুসফুস, বৃক্ক, অন্ত্র এবং অস্থি এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধের জন্য শিশুদের BCG টিকা প্রয়োগ করা হয়। ব্যাকটেরিয়ার ধরণ ও এই জীবাণুর আবিষ্কারক ফরাসি বিজ্ঞানী **Albert Calmette** ও **Camille Guerin** -এর নামানুসারে এ টিকার নাম BCG (Bacillus Calmetee Guerin) করা হয়েছে।

৩. **ডিপিটি টিকা (DPT Vaccine)** : ডিপথেরিয়া (Diphtheria), হুপিংকাশি (Pertussis) এবং ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) এ তিনটি রোগের জন্য ডিপিটি টিকা দেয়া হয়। ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কার রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া (যথাক্রমে *Corynebacterium diphtheriae* ও *Clostridium tetani* নিঃসৃত টক্সিন এবং হুপিংকাশির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার (*Bordetella pertussis*) কোষকে একত্রে নিষ্ক্রিয় করে এ টিকা তৈরি করা হয়।

দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতিকোষের ভূমিকা (Role of Memory Cell in Immune System)

কিছু জমা রাখা এবং প্রয়োজনে তা স্মরণ করার ক্ষমতাকে **স্মৃতি** (memory) বলে। স্মৃতি সংরক্ষণ এবং যথাসময়ে পুনর্ব্যবহার দেহরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত নানান প্রাকৃতিক আক্রমণকারীর শিকার হচ্ছে। মানবদেহ চোখের আড়ালে সে সব আক্রমণ থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করছে তা আমাদের জানা দরকার। আমাদের দেহ প্রতিরক্ষায় কীভাবে, কোন লেভেলে, কোন প্রহরী ক্লান্তিহীন কাজ করে যাচ্ছে তা জানতে পারলে নিরোগ দেহের প্রয়োজনীয়তা ও দেহ নিরোগ রাখার উপায় উদ্ভাবন সহজতর হবে

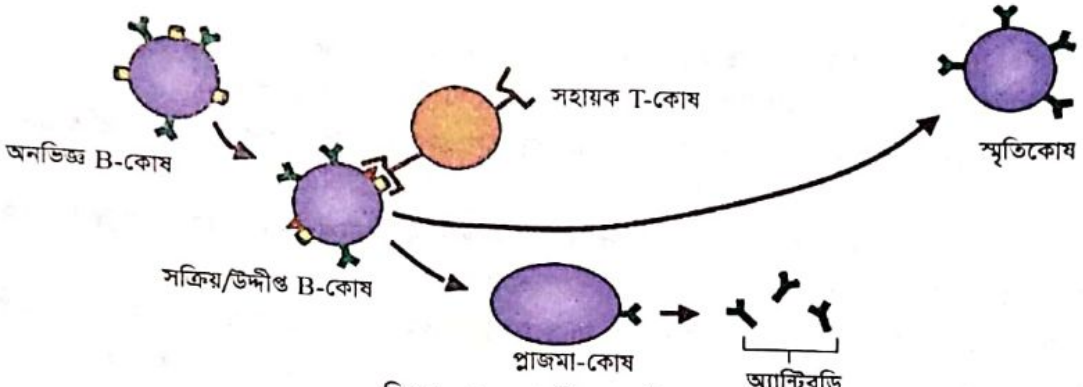

চিত্র ১০.১০ : স্মৃতিকোষ উৎপাদন

প্রতিরক্ষাতন্ত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে অণুজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর: (১) সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট **প্রতিরক্ষা সাড়া** (immune response) দান করা; এবং (২) অনুপ্রবেশকারীর কথা **মনে রাখা**। দুধরনের কোষ এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কোষগুলো সারা দেহে সংবহিত হয়ে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু খুঁজে বেড়ায় এবং আগের কথা মনে রেখে দ্রুত জীবাণুধ্বংসে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জীবাণু সম্বন্ধে আগে থেকেই ধারণা থাকায় রোগ সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হয় কিংবা প্রকাশ ঘটলেও তার মাত্রা থাকে সামান্য, অক্ষতিকর পর্যায়ের। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় স্মৃতিকোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত ও মোকাবিলা করে। স্মৃতিকোষ হচ্ছে লিম্ফোসাইট নামক অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা। লিম্ফোসাইট দুধরনের : **T-লিম্ফোসাইট** ও **B-লিম্ফোসাইট**।

T-লিম্ফোসাইট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে। অন্যদিকে, B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে। এসব কোষ অস্থিমজ্জায় **স্টেমকোষ** (stem cell) থেকে সৃষ্টি হয় এবং লসিকা বাহিকার মাধ্যমে থাইমাস, লসিকাপর্ব, প্লীহা ও হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি রক্ত সংবহতন্ত্রে পৌঁছে পরিণত হয়।

স্মৃতিকোষের (memory T-cell, memory B-cell) প্রধান ভূমিকা হচ্ছে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে অনুপ্রবেশিত জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলা। এভাবে গড়ে উঠে **অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা**। প্রথমবার কোনো জীবাণু দেহে সংক্রমণ ঘটালে দেহ তার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে যেভাবে রোগমুক্ত হয় তাকে **প্রাইমারি সাড়া** (primary response) বলে। আবারও যদি ঐ জীবাণু আক্রমণ করে তখন স্মৃতিকোষগুলো প্রাইমারি সাড়ার স্মৃতিকথা মনে করে দ্রুততর সাড়া দিয়ে দেহকে রোগমুক্ত রাখে। দ্বিতীয়বারের সাড়াকে **সেকেন্ডারি সাড়া** (secondary response) বলে। সেকেন্ডারি সাড়ার কারণে আমরা প্রথম একবার ঘটে যাওয়া সংক্রমণ আর তেমন টের পাই না, কিংবা একেবারেই টের পাই না।

দ্বিতীয়বার কোনো জীবাণুর প্রবেশ ঘটলে স্মৃতি T-কোষ আর স্বাভাবিক না থেকে অতিদ্রুত বিপুল সংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে জীবাণু ধ্বংসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, স্মৃতি B-কোষ মানবদেহের রক্তপ্রবাহে দীর্ঘদিন অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থাকে। এ কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে না কিন্তু সেকেন্ডারি সাড়ায় অ্যান্টিবডি ক্ষরণকারী বিপুল সংখ্যক কোষ সৃষ্টি করে দেহকে রোগমুক্ত রেখে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

CamScanner